

# অমৃত-লীলা

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বনে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণি ।  
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষা মধুতানে ললাস যঃ ॥ ১  
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।  
জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১  
এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।  
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিবসে ॥ ২

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ ।  
ষাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ ৩  
প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।  
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে— ॥ ৪  
“নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিয় নমস্কার ।  
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

মাতৃভক্তশিরোমণিং মাতৃভক্তানাং শিরোভূষণং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । মধুতানে বৈশাখীপূর্ণিমায়াং জগন্নাথবল্লভনাম-  
কৃত্রিমবনে ললাস বিহরিতবান্ । চক্রবর্তী । ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অমৃতলীলার এই উনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি এবং দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ, গম্ভীরার ভিত্তিতে  
মুখ-সংঘর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ-স্পর্শে প্রভুর দিব্যানুত্যাди বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্লো। ১। অম্বয় । মাতৃভক্তশিরোমণি ( মাতৃভক্ত-শিরোমণি ) তং কৃষ্ণচৈতন্যং ( সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-  
চন্দ্রকে ) বন্দে ( আমি বন্দনা করি ) মুখসংঘর্ষা ( ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণকারী ) যঃ ( যিনি ) প্রলপ্য ( প্রলাপ করিয়া )  
মধুতানে ( বসন্তকালে বনে ) ললাস ( বিহার করিয়াছিলেন ) ।

অনুবাদ । আমি সেই মাতৃভক্ত-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রকে বন্দনা করি, যিনি ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ  
করিয়াছিলেন এবং প্রলাপ করিয়া বসন্তকালে বনে বিহার করিয়াছিলেন । ১

মাতৃভক্তশিরোমণিম্—মাতৃভক্তদিগের-মধ্যে শ্রেষ্ঠ । মধুতানে—মধুকালে ( বসন্তকালে—বৈশাখীপূর্ণিমায়া )  
উত্থানে ( জগন্নাথবল্লভ নামক কৃত্রিম উপবনে ) ।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ।

২। উন্মাদ প্রলাপ—দিব্যোন্মাদবশতঃ প্রলাপ ।

৪। বিচ্ছেদ-দুঃখিতা—পুত্রবিচ্ছেদ-দুঃখিতা ( শচীমাতা ) । জননী—শচীমাতাকে । আশ্বাসিতে—  
প্রভুর বার্তা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে ।

৫। ছয় পয়ারে, শচীমাতার নিকট জগদানন্দ পণ্ডিতকে কি কি বলিতে হইবে, প্রভু তাহা উপদেশ  
করিতেছেন ।

কহিয় তাঁহারে—তুমি করহ স্মরণ ।  
 নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিষে চরণ ॥ ৬  
 যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ।  
 সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৭  
 তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ধ্যাস ।  
 বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥ ৮  
 এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ।  
 তোমার অধীন আমি—পুত্র তোমার ॥ ৯  
 নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে ।

যাবৎ জীব' তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥” ১০  
 গোপলীলায় পায়ে যেই প্রসাদ বসনে ।  
 মাতাকে পাঠায় তাহা পুরীর বচনে ॥ ১১  
 জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা ঘটনে ।  
 মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥ ১২  
 মাতৃভক্তগণের প্রভু হয়ে শিরোমণি ।  
 সন্ধ্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৩  
 জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা ।  
 প্রভুর যত নিবেদন সকলি কহিলা ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

“পণ্ডিত, তুমি নদীয়ায় যাও ; যাইয়া মাকে আমার নমস্কার জানাইবে ; আমার নামে (আমার প্রতিনিধিরূপে) তুমি মায়ের পাদপদ্ম ধরিয়া নমস্কার করিবে ।”

৬। “মাকে বলিও, তিনি আমাকে নিত্যই স্মরণ করেন, তাহা আমি জানিতে পারি ; আমিও নিত্যই যাইয়া মায়ের চরণ বন্দন করিয়া থাকি ।” আবির্ভাবে প্রভু নদীয়াতে নিত্য মায়ের চরণ বন্দন করিতেন ।

৭। “আরও বলিও, যেদিন তিনি আমাকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা করেন, আমিও সেইদিন যাইয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য খাইয়া থাকি ।” এস্থলেও প্রভু আবির্ভাবেই যাইতেন ।

৮। আর বলিও, “মায়ের সেবা ছাড়িয়া আমি সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াছি ; ইহা আমার পক্ষে পাগলের কাজই হইয়াছে । ধর্ম্মের নিমিত্ত আমি সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বারা আমি আমার ধর্ম্ম নষ্টই করিয়াছি ; কারণ, মাতৃসেবা ছাড়িয়া কেহ ধর্ম্মলাভ করিতে পারেনা ।”

বাতুল—বাউল, পাগল ; হিতাহিত-জ্ঞানশূণ্য ।

৯। “মায়ের চরণে আমার প্রার্থনা জানাইও, তিনি যেন তাঁহার এই অবোধ ছেলের অপরাধ—মাতৃসেবা-ত্যাগজনিত অপরাধ—ক্ষমা করেন । যদিও আমি সন্ধ্যাসী হইয়া তাঁহার চরণ হইতে দূরে রহিয়াছি, তথাপি আমি তাঁহারই অধীন ; যেহেতু আমি তাঁহার পুত্র ; সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই ; তিনি যেন কৃপা করিয়া নিজগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা ।”

১০। “আমি মায়ের অধীন বলিয়াই, মায়ের আদেশে নীলাচলে বাস করিতেছি ; মায়ের আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিনা ; তাই যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে পারি না ।”

১১। গোপলীলায়—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-উপলক্ষ্যে প্রভু গোপবেশ ধারণ করিয়া নৃত্যাদি করিতেন । প্রভুর এই লীলাকেই এস্থলে গোপলীলা বলা হইয়াছে । প্রসাদ বসনে—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীবস্ত্র । অথবা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র । গোপবেশে নৃত্য-উপলক্ষ্যে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র দিতেন । পুরীর বচনে—শ্রীপাদ পরমানন্দ-পুরীর আদেশে । গোপলীলায় প্রতি বৎসরই প্রভু মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র পাইতেন ; শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর আদেশে প্রতি বৎসরই তাহা প্রভু মাতার নিকটে পাঠাইতেন ।

১২। গোপলীলায় প্রাপ্ত মহাপ্রসাদ ব্যতীত, আরও উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ আনাইয়া, মাতার জন্ত এবং গোড়ের ভক্তগণের জন্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠাইতেন ।

আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিয়া প্রসাদ দিয়া ।  
 মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মামেক রহিয়া ॥ ১৫  
 আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল ।  
 আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥ ১৬  
 তর্জা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠারে ।  
 প্রভুমাত্র বুঝে, কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৭

“প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার ।  
 এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার—॥ ১৮  
 বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল ।  
 বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ১৯  
 বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল ।  
 বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥” ২০

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৫। আচার্য্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি । প্রসাদ দিয়া—মহাপ্রভুর প্রেরিত মহাপ্রসাদ দিয়া ।  
 মাতা ঠাঞি—শচীমাতার নিকটে । আজ্ঞা—নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার অমুমতি ।

জগদানন্দ একমাস নদীয়ায় রহিলেন ; তারপর নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার অল্প শচীমাতার আদেশ লইলেন ।

১৬। আচার্য্যের ঠাঞি—অদ্বৈত আচার্য্যের নিকটে । আজ্ঞা মাগিল—নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার অমুমতি প্রার্থনা করিলেন । সন্দেশ—বার্তা, সংবাদ ।

মহাপ্রভুর নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্বৈতআচার্য্য জগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকটে একটা সংবাদ বলিলেন । এই সংবাদটী একটা তর্জার আকারে বলা হইয়াছিল ।

১৭। তর্জা প্রহেলী—তর্জা ও প্রহেলী প্রায় একার্থবোধক শব্দ । এস্থলে বোধ হয়, “তর্জা”-শব্দ “ভঙ্গীযুক্ত বাক্য”-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । তর্জা প্রহেলী—ভঙ্গীযুক্ত-বাক্যময়ী প্রহেলিকা ।

প্রহেলী—প্রহেলিকা, হেয়ালী ; যাহাতে উদ্দিষ্ট অর্থ-গোপনের উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলি শব্দ বা বাক্য ব্যবহৃত হয় যে, তাহাদের যথাক্রম অর্থ এক রকম হয়, আর আসল অর্থ অল্পরূপ হয়, তাহাকে প্রহেলিকা বলে । “ভঙ্গীযুক্ত কল্পপার্থ স্বরূপার্থস্ত গোপনাং । যত্র বাহ্যস্তরাবর্ষো কথ্যতে সা প্রহেলিকা ।”

ঠারে ঠারে—ইঙ্গিতে ।

প্রভুর নিমিত্ত আচার্য্য যে সংবাদটী পাঠাইলেন, তাহা প্রহেলিকার (হেয়ালীর) আকারে ইঙ্গিতে পাঠাইলেন ; সুতরাং তাহা জগদানন্দ বুঝিতে পারিলেন না, অল্প কেহও বুঝিতে পারিল না ; একমাত্র প্রভুই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন ।

পরবর্তী “বাউলকে কহিয়” ইত্যাদি দুই পয়ায়ে প্রহেলিকা ( বা তর্জাটী ) ব্যক্ত হইয়াছে ।

১৮। আচার্য্য জগদানন্দকে বলিলেন—“প্রভুকে আমার কোটি কোটি নমস্কার জানাইবে ; আর তাঁর চরণে আমার একটা নিবেদন আছে, তাহাও জানাইবে ।” এই নিবেদনটী পরবর্তী দুই পয়ায়ে তর্জায় বলা হইয়াছে ।

১৯-২০। “বাউলকে কহিয়” হইতে “ইহা কহিয়াছে বাউল” পর্য্যন্ত দুই পয়ায়ে আচার্য্যের তর্জা । তর্জার যথাক্রম অর্থ ( বা অর্থ ) এইরূপ :—“জগদানন্দ ! বাউলকে বলিও, লোক বাউল হইল । বাউলকে বলিও, হাটে চাউল বিকায় না । বাউলকে বলিও, কাজে আউল নাই । বাউলকে কহিও, ইহা বাউলে কহিয়াছে ।” মোটামোটা সংবাদটী হইল এই যে—“লোকে বাউল হইয়াছে, হাটে আর চাউল বিকায় না, কাজেও আর আউল নাই ।”

এই তর্জার গূঢ় অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য ।

বাউলকে—বাতুলকে, উন্মত্তকে ; কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ।

লোকে হইল বাউল—সমস্ত লোক প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে ।

হাটে না বিকায় চাউল—প্রত্যেক লোকের ঘরেই যখন যথেষ্ট চাউল থাকে, সুতরাং যখন কাহারও আর চাউলের অভাব থাকে না, তখনই হাটে চাউল বিক্রয় হয় না ; চাউলের দোকানদারকে অনর্থক চাউল লইয়া

এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিল।

নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিল ॥ ২১

তর্জা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিল।

‘তঁার যেই আজ্ঞা’ বলি মৌন করিল ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী ঢাকা ।

হাটে বসিয়া থাকিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ-চাউলের দোকানদার ছিলেন শ্রীঅধৈতাচাৰ্য্য। হাটের মালিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা যাকে তাকে প্রেমরূপ-চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এইরূপে সকল লোকেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রেম পাইয়াছে, সকলেই প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে ; বাকী আর কেউ নাই ; তাই, এখন গ্রাহক-অভাবে প্রেমের হাটে আর প্রেমরূপ চাউল বিক্রয় হয় না ; দোকানদারদিগকে অনর্থক বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রেমকে চাউল বলার হেতু এই যে, চাউল যেমন লোকের দেহ-ধারণের এবং দেহপুষ্টির একমাত্র উপকরণ, তদ্রূপ প্রেমও জীবের স্বরূপে স্থিতির এবং স্বরূপানুবন্ধি কার্য্য করিবার পক্ষে একমাত্র উপকরণ ও সহায়।

আউল—আকুল, আকুলতা, ব্যস্ততা।

পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় অনেক স্থলে শব্দের মধ্যবর্তী “ক্” লোপ পাইতে দেখা যায়। এখনও অনেক স্থলে “দোকান”কে “দোয়ান”, “শিকড়”কে “শিয়ড়”, “রকম”কে “র-অম—এ কি র-অন্ কথ্য”, “নিকাল”কে “নিয়াল—গরুটা নিয়াল (বাহির কর)” ইত্যাদি বলিতে শুনা যায়। সম্ভবতঃ, এই ভাবেই “আকুল” শব্দ “আউলে” পরিণত হইয়াছে।

কাজে নাহিক আউল—কাজে আর ব্যস্ততা নাই। হাটে কেহই চাউল কিনিতে আসে না বলিয়া চাউল বিক্রয়ের অল্প দোকানদারদেরও আর ব্যস্ততা নাই, তাহাদিগকে চুপ্‌চাপ্‌ করিয়াই বসিয়া থাকিতে হয়। গুঢ়ার্থ এই যে, সকল লোকই প্রেমোন্মত্ত হওয়ায় প্রেম বিতরণ-কার্য্যের আর প্রয়োজন নাই ; তাই, যাহাদের উপর প্রেম বিতরণের ভার ছিল, তাহাদের আর কার্য্য-ব্যস্ততা নাই, সকলেই চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া আছে।

তর্জার গুঢ় অর্থ বোধ হয় এই যে :—প্রভু, কলিহত জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দেওয়ার নিমিত্তই তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম ; তুমিও কৃপা করিয়া আসিয়াছ, আসিয়া নির্ঝিঁচারে, যাকে তাকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছ ; এখন সকলেই প্রেম পাইয়াছে, সকলেই প্রেমোন্মত্ত ; কৃষ্ণপ্রেম পায় নাই—এমন লোক এখন আর একজনও নাই ; সুতরাং প্রেম-বিতরণেরও আর কোনও প্রয়োজন নাই।

বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল—শ্রীঅধৈতাচাৰ্য্য আরও বলিলেন, “জগদানন্দ ! তুমি সেই বাউলকে (প্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে) বলিও যে, বাউল (প্রেমোন্মত্ত অধৈত আচার্য্য) ইহা (এই তর্জা) বলিয়াছে।”

২১। এত শুনি—তর্জা শুনিয়া।

হাসিতে লাগিল—প্রহেলী শুনিয়া, তাহার গুঢ় অর্থ না বুঝিয়া এবং যথাক্রম অর্থহাস্তজনক বলিয়া জগদানন্দ হাসিলেন।

প্রভুকে কহিল—আচার্য্যের তর্জা প্রভুকে বলিলেন।

২২। ঈষৎ হাসিল—একটু হাসিলেন। “কাজের সময় ডাকা, আর কাজ সারিয়া গেলেই তাড়াইয়া দেওয়া”—তর্জা শুনিয়া এইরূপ একটা কথা মনে পড়িতেই বোধ হয় প্রভু একটু হাসিলেন। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অধৈতাচাৰ্য্যই প্রভুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন ; এখন, তর্জায় প্রভুকে জানাইলেন—“জগতের কল্যাণ হইয়া গিয়াছে, কল্যাণজনক কোনও কাজই আর বাকী নাই।” ইহা দ্বারা ভঙ্গীতে জানাইলেন যে, “প্রভু, তোমার আর প্রকট থাকার কোনও দরকার নাই, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে তুমি এখন অন্তর্দান করিতে পার।”

তঁার যেই আজ্ঞা—তর্জা শুনিয়া, আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রভু একটু হাসিয়াই বলিলেন—“আচ্ছা, তথাস্ত ; আচার্য্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক,” ইহা বলিয়াই প্রভু চুপ করিয়া রহিলেন।

জানিঞাহো স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে পুছিল—

এই ত তর্জার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥ ২৩

প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল ।

আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৪

উপাসনা-লাগি দেবের করে আবাহন ।

পূজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন ॥ ২৫

পূজা-নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন ।

তর্জার না জানি অর্থ—কিবা তাঁর মন ? ॥ ২৬

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জাতে সমর্থ ।

আমিহো বুঝিতে নারি তর্জার অর্থ ॥ ২৭

শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ ।

স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

মৌন করিল—চুপ করিয়া রহিলেন । অদ্বৈত-আচার্য্য যে তাঁহাকে অন্তর্দান করার ইঙ্গিতই দিয়াছেন, ইহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলে সকলেরই মনে কষ্ট হইবে, তাই প্রভু মৌনাবলম্বন করিলেন ।

২৩। স্বরূপ-দামোদর তর্জার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তথাপি—বোধহয় নিজের মনের সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা নিজে যাহা বুঝিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন, তদ্বিপরীত কিছু শুনিবার লোভেই প্রভুকে তর্জার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ।

২৪। স্বরূপদামোদরের জিজ্ঞাসায় প্রভু তর্জার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না ; প্রভুও অল্প কথার ব্যপদেশে ইঙ্গিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ।

আচার্য্য—অদ্বৈত আচার্য্য । পূজক প্রবল—শক্তিশালী পূজক । আগম-শাস্ত্রের ইত্যাদি—আগম-শাস্ত্রে পূজার যে সমস্ত বিধানাদি আছে, অদ্বৈত-আচার্য্য সে সমস্ত বিধানে বিশেষ অভিজ্ঞ । কুশল—অভিজ্ঞ ।

২৫। আগমের বিধান এই যে, পূজার নিমিত্ত দেবতাকে আহ্বান করিতে হয় ; যতক্ষণ পূজা হয়, ততক্ষণ দেবতাকে পূজাস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় এবং পূজা শেষ হইয়া গেলে দেবতাকে বিসর্জন (বিদায়) দিতে হয় ।

উপাসনা-লাগি—পূজার উদ্দেশ্যে । আবাহন—আহ্বান । করে নিরোধন—দেবতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, অস্থত্র যাইতে দেয় না ।

২৬। পূজা নির্বাহ ইত্যাদি—পূজা শেষ হইয়া গেলে দেবতাকে বিসর্জন দেয় ।

ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন যে, “জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের নিমিত্ত আচার্য্য আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন ; যতক্ষণ প্রেম-প্রচার কার্য্য চলিতেছিল, ততক্ষণ আমাকে রাখিয়াছেন ; এখন, প্রেম-প্রচারের আর প্রয়োজন নাই, তাই আমাকে বিদায় দিতেছেন ।”

তর্জার না জানি অর্থ—সকলের নিকটে যেন তর্জার গূঢ় অভিপ্রায়টি প্রকাশ না পায়, তাই প্রভু বলিলেন, “তর্জার অর্থ আমি জানি না” ।

কিবা তাঁর মন—অদ্বৈত আচার্য্যের অভিপ্রায় কি, তাহাও জানি না ।

২৭। প্রভু যে তর্জার অর্থ বুঝেন নাই, সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত প্রভু বলিলেন—“আচার্য্য মহাযোগেশ্বর ; তিনি নিজেও তর্জা প্রস্তুত করিতে জানেন, সকল তর্জার অর্থও তিনি জানেন, (তর্জাতে সমর্থ) । তর্জার অর্থ বুঝিবার শক্তি আমার নাই ।”

২৮। বিস্মিত—আচার্য্য এমন তর্জা করিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহার অর্থ প্রভুও বুঝিতে পারেন না ; যিনি কত কত কঠিন সমস্তার সমাধান করিতে পারেন, সেই প্রভুও এই তর্জার অর্থ বুঝিলেন না, ইহা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন ।

বিমন—মনে দুঃখিত ; বিষম । স্বরূপ গোসাঞি তর্জার অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন ; তাই প্রভুর লীলা-সম্বরণের সম্ভাষণা বুঝিয়া তিনি বিষম হইলেন ।



সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল ।  
 কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ২৯  
 উন্মাদ-প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে ।  
 রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥ ৩০  
 আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ।  
 উদ্ঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদলক্ষণ ॥ ৩১  
 রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন ।

স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজসখীজন ॥ ৩২  
 পূর্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিল ।  
 সেই শ্লোক পঢ়ি প্রলাপ করিতে লাগিল ॥ ৩৩  
 তথাহি ললিতমাধবে ( ৩২৫ )—  
 ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কতিঃ  
 ক মদ্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ।  
 ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-  
 নিধিস্ময়ম্ স্নহতমঃ ক বত হস্ত বা ধিগ্‌বিধিম্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

হে সখি হে বিশাখে ! নন্দকুলচন্দ্রমা নন্দনন্দনঃ ক বৃত্ত দর্শয় ইতি শেষঃ । শিখিচন্দ্রকালঙ্কতিঃ ময়ূরপুচ্ছ-  
 ভূষিতঃ ক কুত্র । মদ্রমুরলীরবঃ গভীরবংশীধ্বনিঃ ক কুত্র । নু ভো হে সখি ! সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ইন্দ্রনীলমণিকান্তিঃ

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা ।

২৯। দেই দিন হৈতে—যে দিন আচার্য্যের তর্জা পাইলেন, সেই দিন হইতে ।

আর দশা—অতরূপ অবস্থা । এ পর্য্যন্ত অবতারের অমূল্যজিক উদ্দেশ্য জীব-উদ্ধার কার্য্যের অনুরোধে  
 সময় সময় প্রভুর বাহুদশার উদয় হইত ; কিন্তু যে দিন তর্জা পাইলেন, সেই দিন প্রভু বুঝিলেন যে, জীব-উদ্ধার  
 কার্য্য সমাধা হইয়াছে ; তাই সেই দিন হইতে প্রভু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য—ব্রজলীলার আন্বাদন কার্য্যেই সম্পূর্ণরূপে  
 চিত্ত-নিবেশ করিলেন । ইহাই বাহুদৃষ্টিতে প্রভুর অবস্থান্তর ।

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা ইত্যাদি—সেই দিন হইতে, রাধাভাবে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ  
 বাড়িয়া গেল ।

৩০। উন্মাদ প্রলাপ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদের আচরণ এবং প্রলাপ । রাধাভাবাবেশে—কৃষ্ণবিরহব্যাকুল  
 শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া । অনুক্ষণ—সর্বদা, প্রতিক্ষণে ।

৩১। আচম্বিতে ইত্যাদি—শ্রীরাধাভাবের আবেশে হঠাৎ প্রভুর মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ অকুরের রথে চড়িয়া  
 মথুরায় গমন করিতেছেন ।

উদ্ঘূর্ণা ইত্যাদি—দিব্যোন্মাদের ফলে প্রভু উদ্ঘূর্ণাদশা প্রাপ্ত হইলেন ( কৃষ্ণবিচ্ছেদে ) । ৩১৪।১৬ পয়ারের  
 টীকায় উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ দ্রষ্টব্য । প্রেম-বৈবশ্ণের কায়িক-অভিব্যক্তিই উদ্ঘূর্ণা ।

৩২। দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইয়া প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা এবং স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দকে তাঁহার  
 সখী মনে করিয়া তাঁহাদের গলা গুড়াইয়া ধরিয়া নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেন । এই সমস্ত উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ ।

স্বরূপে পুছয়ে—স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; “ক নন্দকুলচন্দ্রমা” ইত্যাদি পশ্চাত্ত্ব শ্লোকের কথা জিজ্ঞাসা  
 করিলেন ।

৩৩। পূর্বে—ব্রজলীলায় । যেন—যেইরূপে ।

সেই শ্লোক—“ক নন্দকুলচন্দ্রমা” ইত্যাদি যে শ্লোক ব্রজলীলায় শ্রীরাধা বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
 সেই শ্লোক ।

প্রভু প্রথমতঃ ঐ শ্লোকটি পড়িলেন ; তারপর প্রলাপচ্ছলে তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন । ইহা শ্রীকৃষ্ণ-  
 গোস্বামীর ললিতমাধবের শ্লোক ; শ্রীকৃষ্ণ যখন নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে তাঁহার রচিত ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব  
 নাটক শুনাইয়াছিলেন, তখনই বোধহয় প্রভু এই শ্লোকটী মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন ।

শ্লো। ২। অময় । অময় সহজ ।

যথারাগঃ—

ব্রজেন্দ্রকুণ-দুঃখ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু  
জন্মি কৈল জগৎ উজ্জোর ।

কান্ত্যমৃত যেনা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে,  
ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ক কুত্র । রাসরসতাণ্ডবী রাসরসনর্তনশীলঃ ক কুত্র । জীবরক্ষৌষধিঃ প্রাণরক্ষণায় মুখৌষধিঃ ক কুত্র । নিধিঃ অমূল্যরত্নং মম স্নহন্তমঃ স ক কুত্র । বত হন্ত হা বিধিঃ ধিক্ । চক্রবর্তী । ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

**অমুবাদ ।** শ্রীরাধা কহিতেছেন—হে সখি ! নন্দকুল-চন্দ্রমা কোথায় ? শিখি-পুচ্ছ-ভূষণ ( শ্রীকৃষ্ণ ) কোথায় ? যিনি গম্ভীর মুরলী-ধ্বনি করেন, তিনি কোথায় ? ইন্দ্রনীল-মণির ছায় কাস্তি যাহার, তিনি কোথায় ? রাস-রস-তাণ্ডবী কোথায় ? হে সখি ! আমার প্রাণরক্ষার ঔষধি কোথায় ? হায় ! হায় ! আমার স্নহন্তম—আমার অমূল্যরত্ন কোথায় ? ( এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে আমার বিয়োগ উৎপাদন করিল ) হায় ! সেই বিধিকে ধিক্ । ২

( অকুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে পর বিরহ-জ্বালা-বিহ্বলা শ্রীরাধা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বিশাখার প্রতি বলিয়াছিলেন )

**নন্দকুলচন্দ্রমাঃ**—নন্দের ( শ্রীনন্দমহারাজের ) কুলের ( বংশের ) চন্দ্রমা ( চন্দ্রসদৃশ ) ; চন্দ্র উদিত হইলে যেমন আকাশের অন্ধকার দূরীভূত হয়, সমগ্র আকাশ নিম্নল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবেও নন্দবংশের সমস্ত শোক-দুঃখ তিরোহিত হইয়াছে, সুখের হিম্মলে তাহা ভাসমান হইয়া আছে । নন্দবংশের মুখোজ্জলকারী । **শিখিচন্দ্রিকালঙ্কতিঃ**—শিখীর ( ময়ূরের ) চন্দ্রিকাই ( পুচ্ছই—চন্দ্রের ছায় চিহ্নবিশিষ্ট ময়ূরপুচ্ছই ) অলঙ্কৃতি ( অলঙ্কার ) যাহার ; ময়ূরপুচ্ছভূষিত । **মন্দ্রমুরলীরবঃ**—মন্দ্র ( গম্ভীর ) মুরলীর রব যাহার ; যাহার মধুর-মুরলীধ্বনি অত্যন্ত গম্ভীর । **সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ**—সুরেন্দ্রনীলের ( ইন্দ্রনীলমণির ) দ্যুতির ছায় দ্যুতি ( কাস্তি ) যাহার ; যাহার অঙ্গকাস্তি ইন্দ্রনীলমণির কাস্তির ছায় স্নিগ্ধ ও সুন্দর । **রাসরসতাণ্ডবী**—রাসরসে নর্তনশীল ; রাস-রসের উল্লাসে যিনি নৃত্য করিয়া থাকেন । **জীবরক্ষৌষধিঃ**—জীবের ( জীবনের, প্রাণের ) রক্ষাবিষয়ে ঔষধি যিনি ; যিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে মহৌষধিতুল্য ; প্রাণের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একমাত্র যাহার দর্শনে প্রাণরক্ষা হইতে পারে । **নিধিঃ**—অমূল্যরত্ন ; যিনি আমার পক্ষে অমূল্যরত্ন, আমার একমাত্র গৌরবের সম্পত্তিতুল্য, যাহার অভাবে আমার জীবনের কোনও মূল্য—কোনই সার্থকতা থাকে না । **স্নহন্তমঃ**—প্রিয়তম, বন্ধুদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ । **ধিক্ বিধিম্**—যে বিধাতা আমার এইরূপ দুর্দশার বিধান করিয়াছেন, যাহার বিধানে আমার এতাদৃশ স্নহন্তমও আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, সেই বিধাতাকে ধিক্ ।

এই শ্লোকের তাৎপর্য পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে বিবৃত হইয়াছে ।

৩৪ । কৃষ্ণবিরহখিন্না শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রলাপ করিতে করিতে প্রভু শ্লোকের অর্থ করিতেছেন । প্রথমে “ক নন্দকুলচন্দ্রমা” অংশের অর্থ করিতেছেন ( নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায় ? ) । চন্দ্রমা-শব্দের অর্থ চন্দ্র ; চন্দ্রের আবির্ভাব ক্ষীর-সমুদ্রে, চন্দ্র সমস্ত জগৎকে আলো দান করে । নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রও কোনও এক ক্ষীর-সমুদ্র বিশেষে আবিভূত হইয়াছেন এবং তিনিও সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন ( শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে জগতের দুঃখ-দৈত্যাदि অন্তর্হিত হওয়ায় সকলের চিত্ত আনন্দধারায় অতিবিক্ত হইয়া প্রফুল্লতা ধারণ করিয়াছে )—তাহাই প্রথম ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন ।

গোর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

**ব্রজেন্দ্র**—ব্রজরাজ শ্রীনন্দ মহারাজা । **দুগ্ধ-সিন্ধু**—দুগ্ধের সমুদ্র । **ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু**—শ্রীনন্দ-মহারাজের বংশরূপ দুগ্ধের সমুদ্র । শ্রীনন্দের কুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ; চন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা দেওয়ার নন্দকুলকে দুগ্ধসিন্ধুর সঙ্গে তুলিত করা হইয়াছে ; যেহেতু, দুগ্ধসিন্ধুতেই চন্দ্রের আবির্ভাব হয় । **তাঁহে**—সেই ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধুতে । **পূর্ণ ইন্দু**—পূর্ণচন্দ্র ; যাহার কখনও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, যিনি সর্বদাই পূর্ণ থাকেন, এইরূপ চন্দ্র । কৃষ্ণই এইরূপ চন্দ্র । **জন্মি**—জন্মিয়া, আবির্ভূত হইয়া ( ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধুতে ) ।

**উজ্জল**—উজ্জল, আলোকিত । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করায় সকলেরই বিষাদ-দৈন্তাদি দূরীভূত হইয়াছে, সকলের চিত্ত এবং বদনই আনন্দের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে ।

যাহার কখনও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, যিনি সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকেন—শ্রীকৃষ্ণরূপ সেই পূর্ণচন্দ্র শ্রীনন্দকুলরূপ দুগ্ধ-সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় লাভ্য ও প্রীতির জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়া সমুজ্জল করিয়াছেন ।

চন্দ্রের আর একটি গুণ এই যে, চন্দ্র অমৃত দান করে, সেই অমৃত পান করিয়া চকোর জীবন ধারণ করে ; শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রেরও যে এই গুণটী আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন ।

**কান্ত্যমৃত**—শ্রীকৃষ্ণের কান্তি (কমনীয় অঙ্গজ্যোতি, লাভ্য)-রূপ অমৃত । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিই তাঁহার (নন্দকুলচন্দ্রমার) অমৃত । **পিয়া**—পান করিয়া । **জীয়ে**—জীবন ধারণ করে । **ব্রজজনের নয়নচকোর**—ব্রজবাসীদিগের নয়ন-রূপ চকোর । **চকোর**—এক রকম পক্ষী, চন্দ্রের সূধা পান করিয়া জীবন ধারণ করে ।

চন্দ্রের সূধা পান করিয়া যেমন চকোর-পক্ষী জীবন ধারণ করে, এই শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণচন্দ্রের অঙ্গ-কান্তিরূপ সূধা সর্বদা পান করিয়াও ব্রজবাসীদিগের নয়নরূপ চকোর জীবন ধারণ করিয়া থাকে ।

চকোরের সঙ্গে নয়নের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, চকোর যেমন চন্দ্রের সূধা ব্যতীত অপর কিছুই পান করিয়া বাঁচিতে পারে না, তাই অপর কিছু পান করিতেও চাহে না—তদ্রূপ, ব্রজবাসীদিগের নয়নও শ্রীকৃষ্ণের রূপ ব্যতীত অণু কিছু দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাই অণু কিছু দেখিতেও ইচ্ছা করে না । আবার চন্দ্রের সূধা যেমন চকোরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, চকোরকে উত্তরোত্তর আরও বেশী সূধা পান করিবার শক্তি দেয়, তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শন করিলেও, তাহা উত্তরোত্তর আরও বেশী করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ব্রজবাসীদের নয়নের বলবতী পিপাসা জন্মে ।

“জীয়ে” শব্দের সার্থকতা এইরূপ । কেবল প্রাণধারণ করিলেই প্রকৃতরূপে বাঁচিয়া থাকা বলা যায় না ; প্রাণধারণের সার্থকতাতেই প্রকৃত জীবন (বাঁচা) । যে লোক সর্বদাই নিদ্রা ও আলগ্নে কাল কাটায়, তাহার জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই, তাহার জীবনেও মৃত্যুতে কোনও পার্থক্য নাই—তাহার জীবনও মৃত্যুতুল্যই । এইরূপে নয়নের সার্থকতাতেই নয়নের জীবন । কিন্তু নয়নের সার্থকতা কিসে হয় ? দেখিবার নিমিত্তই নয়ন ; চিত্তের তৃপ্তিদায়ক সুন্দর বস্তুর দর্শনেই নয়নের সার্থকতা । শ্রীকৃষ্ণরূপেই সৌন্দর্য-মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেই নয়নের সার্থকতারও পরাকাষ্ঠা ; যে নয়ন শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখিতে পায়, সেই নয়নকেই জীবিত বলা যায় । শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত অণু কোনও রূপ দেখিলে ব্রজবাসীরা তৃপ্তি পান না, তাঁহাদের নয়নের সার্থকতা হইতেছে বলিয়াও মনে করেন না ; তাই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি দেখিয়াই তাঁহাদের নয়ন জীবিত থাকে ।

“পিয়ে” শব্দেরও বোধহয় একটা ধ্বনি আছে । ব্রজবাসীদিগের নয়ন শ্রীকৃষ্ণের কান্তি-সূধা নিরন্তর পান করে । তরল বস্তুই পান করা যায় ; কঠিন বস্তু পান করা যায় না, ভোজন করা যায় । পানীয় তরল বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে পান করা যায় ; কিন্তু কঠিন ভোজ্য বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোজন করা চলে না ; প্রতি দুই গ্রাসের মধ্যে ব্যবধান থাকে । ত্রিপদীর “পিয়ে” শব্দে বোধহয় পানের নিরবচ্ছিন্নতা ধ্বনিত হইতেছে । ব্রজবাসীদিগের নয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপসূধা পান করিবার নিমিত্ত লালসিত ; তাই ব্রজবাসীগণ নয়নের পলক-নির্মাতা বিধাতাকে পর্যন্ত



সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন ॥  
কণেক ঘাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,  
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥ ক্র ॥ ৩৫

এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী,  
নিজকরামৃত দিয়া দান ।  
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁই মোর চন্দ্র সেই,  
দেখাও সখি ! রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তিরস্কার করিয়াছেন—কেন তিনি চক্ষুর পলক দিলেন ? পলক না দিলে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে পারিতেন ।

৩৫ । অসমোদ্ধমাধুৰ্য্যময় শ্রীকৃষ্ণরূপের উল্লেখ করাতে সেই রূপ দর্শনের নিমিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল ; তাই পার্শ্ববর্তী স্বরূপ-দামোদরকে নিজের ( রাধার ) সখী মনে করিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তিনি বলিলেন—“সখি হে !” ইত্যাদি ।

৩৬ । কুমুদিনী ( সাপুলা ) দিবাভাগে মুদ্রিত হইয়া থাকে, রাত্রিতে প্রফুল্লিত হয় ; ইহা লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, কুমুদিনীসমূহ দিবাভাগে যেন সূর্য্যের উত্তাপেই ত্রিয়মাণ হইয়া থাকে ; চন্দ্র রাত্রিকালে নিজের কিরণরূপ অমৃতদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করে, প্রফুল্লিত করে । ইহা চন্দ্রের একটা বিশেষ গুণ । শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রেরও যে এই গুণ আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন । এই ত্রিপদীতে কুমুদিনীর সঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণের, সূর্য্যতাপের সঙ্গে তাঁহাদের কন্দর্পপীড়ার এবং চন্দ্রকিরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-স্পর্শের তুলনা করা হইয়াছে । যেমন কুমুদিনীগণ সূর্য্য-তাপে ত্রিয়মাণ হইয়া থাকে, চন্দ্র নিজের কিরণদ্বারা তাহাদিগকে সজীবিত করে ; তদ্রূপ ব্রজরমণীগণ কন্দর্পপীড়ায় ত্রিয়মাণ হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তস্পর্শদ্বারা তাঁহাদের কন্দর্পপীড়া দূর করিয়া তাঁহাদিগকে সজীবিত করেন ।

কাম—কন্দর্প । ১।৪।২৫-শ্লোক এবং ২।৮।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । অর্ক—সূর্য্য । তপ্ত—তাপিত ।

কামার্ক—কন্দর্পরূপ সূর্য্য । সূর্য্যের উত্তাপে যেমন কুমুদিনীগণ বিশীর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ব্রজদেবীগণও কন্দর্প-পীড়ায় বিশীর্ণ হইয়া যান । তাই কন্দর্পকে সূর্য্যসদৃশ বলা হইয়াছে ।

কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী—কন্দর্পরূপ সূর্য্যের তাপে তাপিত ব্রজরমণীরূপ কুমুদিনী ।

ব্রজের রমণী ইত্যাদি—ব্রজরমণীগণ কন্দর্পরূপ সূর্য্যের তাপে তাপিত কুমুদিনীতুল্য । কুমুদিনীগণ যেমন সূর্য্যের তাপে তাপিত হইয়া ত্রিয়মাণ হয়, ব্রজরমণীগণও তদ্রূপ কন্দর্প-পীড়ায় ( কন্দর্প-জ্বালায় ) জর্জরিত হয়েন ।

নিজ করামৃত—নিজের কররূপ অমৃত ; চন্দ্রপক্ষে কর-শব্দের অর্থ কিরণ ; কৃষ্ণ-পক্ষে কর-শব্দের অর্থ হস্ত বা হস্তস্পর্শ । চন্দ্র যেমন নিজের কিরণরূপ অমৃত দ্বারা ত্রিয়মাণা কুমুদিনীকে প্রফুল্ল করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি নিজের হস্তস্পর্শদ্বারা কন্দর্পজ্বালায় জর্জরিতা ব্রজরমণীকে প্রফুল্ল করেন ।

প্রফুল্লিত—কুমুদিনী-পক্ষে প্রফুল্লিত ; আর ব্রজরমণী-পক্ষে আনন্দোৎফুল্ল । কাঁই—কোথায় । চন্দ্র সেই—সেই কৃষ্ণরূপ চন্দ্র । এপর্য্যন্ত “ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ” অংশের অর্থ গেল ।

“ব্রজেন্দ্রকুল-ছুদ্ধ-সিদ্ধ” হইতে “রাখ মোর প্রাণ” পর্য্যন্ত :—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-খিনী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্-মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরকে নিজের সখী মনে করিয়া মর্ম্মস্পর্শী দুঃখের সহিত বলিলেন,—“সখি ! নন্দকুলচন্দ্র আমার সেই কৃষ্ণ কোথায় ? সখি ! আমার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্র-নন্দন তো সত্য সত্যই চন্দ্রতুল্য, চন্দ্রের সমস্ত গুণই তো তাঁহাতে আছে ; না-না-সখি ! চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী গুণ তাঁতে আছে । এই আকাশের চন্দ্রের তো হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে, কলঙ্ক আছে ; কিন্তু সখি ! আমার কৃষ্ণ-শশী যে অকলঙ্ক, তাঁর হ্রাসবৃদ্ধি নাই সখি ! তিনি নিত্যই পরিপূর্ণ—আর এই আকাশের চন্দ্র অগত্যা আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল করে বটে ; কিন্তু গুহার মধ্যে তার কিরণ তো প্রবেশ করিতে পারেনা, সখি ! কিন্তু আমার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দহাসিরূপ জ্যোৎস্না জগদ্বাসী জীবের চিত্তগুহার বিষাদরূপ অন্ধকার পর্য্যন্ত দূরীভূত করিয়া সকলের চিত্ত ও মুখমণ্ডলকে অপূর্ণ আনন্দ-ধারায় পরিষিক্ত করিয়া দেয় । সখি ! চকোর যেমন

কাহাঁ সে চুড়ার ঠান, শিখিপিঞ্জের উড়ান,  
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।

পীতাম্বর তড়িদ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,  
নবান্দু জিনি শ্যাম তনু ॥ ৩৭

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,  
কৃষ্ণতনু যেন আত্ম-আঠা ।

নারীর মন পৈশে হায়, যত্নে নাহি বহিরায,  
তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-ভরসিঙ্গী টীকা ।

চন্দ্ৰের স্তম্ভ পান করিয়া জীবন ধারণ করে, ব্রজবাসীদিগের নয়ন-চকোরও তেমনি কৃষ্ণচন্দ্ৰের অঙ্গকাঙ্ক্ষারূপ অমৃত পান করিয়াই কৃতার্থতা লাভ করে । তাহা দেখিতে না পাইয়া আমার নয়ন কিরূপে বাঁচিতে পারে সখি ! সখি, সৌন্দর্য-মাধুর্যের আধার আমার প্রাণবল্লভের রূপ ; তাঁহার বদনমণ্ডল লাবণ্যমুতের জন্মস্থান ; কবে সখি, আমি নির্ণিমেষ-নয়নে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহা দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিব ? তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে । কোথায় সখি, আমার প্রাণকৃষ্ণ ? সখি, একবার আমায় তাঁকে দেখা । নিমেষ-পরিমিত কালও যাহাকে দেখিতে না পাইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, এতদিন পর্যন্ত তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি, সখি ! তাঁহার অদর্শনে আমার জীবন গেল সখি ! তোকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, শীঘ্র তাঁকে একবার দেখা, নতুবা আমি বাঁচিব না সখি ! কন্দর্পের অকরণ অত্যাচারও যে আর সহ্য হয় না সখি ! তীক্ষ্ণ-শরজালে বিদ্ধ করিয়া আমার হৃদয় জর্জরিত করিতেছে । আবার মধ্যাহ্ন-মার্ভণ্ডের জ্বালা অপেক্ষাও অধিকতর জ্বালা দিয়া আমাকে দগ্ধীভূত করিতেছে ! কি করিব সখি ! এই বিপদ হইতে আমাকে কে উদ্ধার করিবে— সেই নন্দকুল-চন্দ্র ব্যতীত ? প্রথর-সূর্য্যকর-তপ্ত কুমুদিনীর প্রফুল্লতাবিধান চন্দ্রব্যতীত আর কে করিতে পারে সখি ! আর কার করায়ুতস্পর্শে কুমুদিনী পুনর্জীবিত হইতে পারে ? তাই মিনতি করিয়া বলি সখি, একবার সেই নন্দকুল-চন্দ্রমাকে দেখা, দেখাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর সখি !”

৩৭। এক্ষণে “ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কতিঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন ।

কাহাঁ—কোথায় । ঠান—স্থান, স্থিতি । চুড়ার ঠান—চুড়ার স্থান ; যাহার মস্তকে চুড়ার স্থান, সেই শ্রীকৃষ্ণ । কাহাঁ সে চুড়ার ঠান—যাহার মস্তকে চুড়া শোভা পায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? শিখিপিঞ্জ—ময়ূরের পুচ্ছ । উড়ান—উড়ানতা । শিখি পিঞ্জের উড়ান—চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছের উড্ডীনতা । “শিখিপিঞ্জের উড়ান” কিরূপ তাহা বলিতেছেন—“নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু”—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনুর উপরিভাগে চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছ যখন উড়িতে থাকে, তখন মনে হয় যেন নূতন মেঘের মধ্যে ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সঙ্গে নবমেঘের বর্ণের সাদৃশ্য আছে ; আর ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণের সঙ্গেও ময়ূর-পুচ্ছের বিবিধ বর্ণের সাদৃশ্য আছে ; এজ্ঞ এই উপমা ।

শ্রীকৃষ্ণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা দিয়া ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছের তুলনা দেওয়া হইয়াছে । মেঘের অগ্নাচ্ছ লক্ষণও যে শ্রীকৃষ্ণে আছে, তাহাও দেখাইতেছেন ।

মেঘে তড়িৎ থাকে ; শ্রীকৃষ্ণরূপ-মেঘেও তড়িৎ আছে ; শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনই তড়িৎতুল্য ( বর্ণসাম্য ) । মেঘের নীচে দিয়া অনেক সময় শুভ্রবক-পংক্তিকে মালার আকারে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়, তখন মনে হয় যেন মেঘের দেহেই শুভ্র মালা ছলিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থিত মুক্তামালাও শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে তদ্রূপ শোভা পায় ।

পীতাম্বর—পীতবর্ণ বস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণের পরিধানের । তড়িৎদ্যুতি—তড়িতের ( বিদ্যুতের ) দ্যুতি ( জ্যোতি ) । শ্রীকৃষ্ণের পরিধানবস্ত্রের বর্ণ বিদ্যুতের বর্ণের ছায় পীত । তাই বর্ণসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনকে তড়িদ্যুতি বলা হইয়াছে । মুক্তামালা—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিলম্বিত শ্বেতবর্ণ যুক্তার মালা । বকপাঁতি—বকের পংক্তি ( শ্রেণী ) ; মেঘের কোলে মালার আকারে সজ্জিত শ্বেত বকশ্রেণী । নবান্দু—নূতন মেঘ । শ্যামতনু—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহ । শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহ বর্ণের মাধুর্য্যে নূতন মেঘকেও পরাজিত করে ।

৩৮। নয়নে লাগে—দৃষ্টিগোচর হয় ( শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনু ) । “নয়নে”-স্থলে “হৃদয়ে”-পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

**কৃষ্ণতনু**—কৃষ্ণের দেহ ; কৃষ্ণরূপ । **আত্ম-আঠা**—আমগাছের আঠা । আমগাছের আঠা যেখানে একবার লাগে, কিছুতেই সেখান হইতে তাহাকে সহজে উঠান যায় না ; কৃষ্ণের রূপও একবার যদি নয়নের ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে হৃদয় হইতে দূর করা যায় না । এজন্ত ক্রিয়াসাম্যে, কৃষ্ণতনুকে ( কৃষ্ণরূপকে ) আত্ম-আঠার তুল্য বলা হইয়াছে ।

**পৈশে**—প্রবেশ করে ( কৃষ্ণতনু ) । **যত্নে নাহি বাহিরায়**—( কৃষ্ণতনুকে নারীর মন হইতে ) বাহির করিবার জন্ত অনেক যত্ন করিলেও বাহির ( দূর ) করা যায় না ।

**শ্রীকৃষ্ণরূপ** ( কৃষ্ণতনু ) যদি নারীর মনে একবার প্রবেশ করিতে পারে, তবে সেইখানেই তাহা থাকিয়া বাইবে ; অনেক যত্ন করিলেও শ্রীকৃষ্ণরূপকে নারীর মন হইতে দূর করা সম্ভব হয়না । এজন্তই কৃষ্ণতনুকে সেয়াকুলেব কাঁটার তুল্য বলা হইয়াছে ।

**সেয়াকুল**—একরকম কাঁটা গাছ । ইহার কাঁটা সহজেই লোকের শরীরে প্রবেশ করে ; কিন্তু বাহির করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সহজে বাহির হইতে চায় না । ইহার গায়ে বোধহয় স্থূল স্থূল কাঁটা আছে, যাহার মুখ বিপরীত দিকে, গাছের গোড়ার দিকে ।

কাঁটার সঙ্গে কৃষ্ণরূপের তুলনা দেওয়ার আরও তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে, কাঁটা যেমন শরীরের মধ্যে থাকিয়া যন্ত্রণা দেয়, শ্রীকৃষ্ণরূপও মনের মধ্যে থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া কষ্টকবৎ যন্ত্রণা দেয় ।

এপর্য্যন্ত “ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কতিঃ” অংশের অর্থ গেল ।

“কাহাঁ সে চুড়ার ঠান” হইতে “সেয়াকুলের কাঁটা” পর্য্যন্ত :—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—“সখি ! শিখিপিজ্জ-মৌলী আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায় ? শ্রামসুন্দরের মস্তকস্থিত চুড়ার উপরে যখন নীল-পীত-লোহিতাদি নানাবর্ণ-খচিত শিখিপুচ্ছ উড়িতে থাকে, তখন বন্ধুর সেই শ্রামজ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে শিখিপুচ্ছের কতই না অপূৰ্ণ শোভা হইয়া থাকে ! ঠিক যেন নবমেঘে নানাবর্ণ-খচিত ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে ! সখি, আমার শ্রামসুন্দরকে দেখিলে বাস্তবিকই নবীন মেঘ বলিয়াই মনে হয় ; মেঘ বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু মেঘের সঙ্গে শ্রামসুন্দরের তুলনা হইতে পারে না । তাঁহার অঙ্গের শ্রামবর্ণ, স্নিগ্ধতায় এবং উজ্জলতায় নবীন মেঘকেও যে পরাজিত করিয়া দেয় সখি ! আকাশে নূতন মেঘের উদয় হইলে, মালার আকারে সারি বাঁধিয়া সাদা সাদা বকগুলি যখন উড়িয়া যায়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তখন যে শোভা হয়, গুহ্র মুক্তাহার-শোভিত—শ্রামসুন্দরের ইন্দ্রনীলমণি-কবাটতুল্য সুবিশাল বক্ষের শোভার নিকটে তাহা অতি তুচ্ছ সখি ! বন্ধুর আমার পীতবসনের বর্ণ বিদ্রাভের বর্ণের শ্রায় বটে ; বিদ্র্যং অপেক্ষাও বন্ধুর পীতবসনের অপূৰ্ণতা আছে সখি ! বিদ্র্যং তো চঞ্চল, শ্রামসুন্দরের পীতবসন অচঞ্চল, স্থির ; বিদ্র্যং মেঘকে জড়াইয়া থাকিতে পারে না, মেঘের কোলে একটু হাসিয়া আবার মেঘের কোলেই লুকাইয়া যায় ; কিন্তু শ্রামসুন্দরের পীতবসন শ্রামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেও অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে, আর শ্রামসুন্দরের শ্রাম-অঙ্গকেও অপূৰ্ণ শোভা-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে ; সৌদামিনীঘেরা নবীন-মেঘ যদি দেখিতে সাধ হয়, তবে একবার পীতাম্বর-ধর শ্রামসুন্দরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর সখি ; দেখিবে কি অপূৰ্ণ রূপ ! একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারিবে না—ভুলিতে চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারিবে না ! এই অপরূপ শ্রামরূপ, একবার যিনি দেখিয়াছেন, অমনি তাঁর নয়নের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া লাগিয়াছে, মরম হইতে আর এই রূপকে কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না সখি ! এ যেন আমের আঠার মতনই হৃদয়ে লাগিয়া থাকে সখি ! সেয়াকুলের কাঁটা যেমন সহজেই লোকের দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু একবার প্রবেশ করিলে যেমন কিছুতেই সহজে তাহাকে বাহির করা যায় না—কৃষ্ণরূপও তদ্রূপ সখি ! কৃষ্ণরূপ দৃষ্টিমাত্রেই নারীর চিত্তে আসন পাতিয়া বসে, কিছুতেই আর তাহাকে হৃদয় হইতে বাহির করা যায় না সখি !”

জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি, শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না-সানি  
যেই কান্তি জগত মাতায় । জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা।

৩৯। এক্ষণে “ক মু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন।

এই ত্রিপদীতে, পূর্ব ত্রিপদী-উক্ত “কৃষ্ণতমুর” আরও অপূর্ব আকর্ষণের কথা বলিতেছেন।

“জিনিয়া তমালদ্যুতি” ইত্যাদি ত্রিপদীর অর্থ—ইন্দ্রনীলমণিসম যে (অনির্কচনীয়) কান্তি তমালদ্যুতিকেও পরাজিত করে এবং যে অনির্কচনীয় কান্তি জগৎকে মত্ত করে, তাহাতে (তাতে) শৃঙ্গার-রস ছানিয়া, তাতে (তাহার সঙ্গে, কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে) চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানিয়াই (মিশাইয়াই) বোধ হয় (জানি) বিধি তাহাকে (তায়, কৃষ্ণতমুরকে) নির্মাণ করিল।

জিনিয়া তমালদ্যুতি—তরুণ তমালের কান্তিকেও পরাজিত করে যে অনির্কচনীয় কান্তি। ইন্দ্রনীলসম কান্তি—ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ছায় কোন এক অনির্কচনীয় কান্তি। যেই কান্তি—যে অনির্কচনীয় কান্তি বা অদ্যুতি। জগত মাতায়—আনন্দ-কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া সমস্ত জগৎসীকে আনন্দোন্মত্ত করে।

শৃঙ্গাররস—মধুর রস, যাহা জগতের নারীবৃন্দকে উন্মত্ত করে। তাতে—সেই কান্তিতে। ছানি—ছাঁকিয়া। শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি—ইন্দ্রনীলমণির কান্তির তুল্য যেই কান্তি তরুণ-তমালের কান্তিকেও মনোরমতায় পরাজিত করে, এবং যে কান্তি সমস্ত জগৎকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া থাকে, সেই অপূর্ব কান্তিতে সর্কচিহ্নোন্মাদক শৃঙ্গার-রসকে ছাঁকিয়া। এইরূপে ছাঁকার ফলে শৃঙ্গাররস ইন্দ্রনীলমণির কান্তির সঙ্গে সর্কতোভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় এবং পরে অপর কোনও বস্তুর সঙ্গে ইহাকে মিলাইবারও সুবিধা হয়। অধিকন্তু উক্ত কান্তির মাদকতার সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের মাদকতা মিশ্রিত হইয়া একটি অনির্কচনীয় মাদকতাও উৎপন্ন হয়।

“শৃঙ্গাররস তাতে ছানি” স্থলে “শৃঙ্গার-রস-সার ছানি” পাঠান্তরও আছে। অর্থ—শৃঙ্গার-রসের সারকে (শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণের সঙ্গে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ যে রস আশ্বাদন করেন, তাহাকে) উক্ত কান্তিতে ছাঁকিয়া।

তাতে—তাহাতে; তাহার সঙ্গে; সর্কচিহ্নোন্মাদিকা কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে। চন্দ্রজ্যোৎস্না—চন্দ্রের জ্যোৎস্না। চন্দ্র-জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, চাকচিক্য, অন্ধকার-দূরীকরণত্ব, চিত্তের উল্লাস-জনকত্ব এবং সন্তাপ-হারিত্ব সর্কজন-বিদিত। সানি—মিশাইয়া, মিশ্রিত করিয়া। তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি—ইন্দ্রনীলমণির কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশ্রিত করিয়া। এই মিশ্রণের ফলে, অনির্কচনীয় কান্তির ও শৃঙ্গার-রসের মাদকতার সঙ্গে চন্দ্রজ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, চাকচিক্য, চিত্তের উল্লাসজনকত্ব এবং বিরহ-সন্তাপহারিত্ব মিশ্রিত হইয়াছে। জানি—যেন; বোধ হয়। বিধি—সৃষ্টিকর্তা বিধাতা। নিরমিল—নির্মাণ করিল। তায়—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকে। পূর্ব ত্রিপদী-উক্ত কৃষ্ণতমুর।

“জিনিয়া তমালদ্যুতি” হইতে “বিধি নিরমিল তায়” পর্য্যন্ত :—শ্রীকৃষ্ণতমুর অনির্কচনীয় আকর্ষণত্বের কথা বলিতে বলিতে প্রভু আরও বলিলেন—“সখি! শ্রীকৃষ্ণতমুর অদ্ভুত আকর্ষণ-ক্ষমতার কথা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই; শ্রীকৃষ্ণের শ্রামল-অঙ্গ-কান্তির তুলনাও জগতে পাওয়া যায় না; তরুণ তমালের স্নিগ্ধ-শ্রামল-কান্তিও ইহার নিকটে পরাভূত; শ্রীকৃষ্ণের কান্তির সঙ্গে ইন্দ্রনীলমণির কান্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু ইহা ইন্দ্রনীলমণির কান্তি তো নহে; কারণ, ইন্দ্রনীলমণির কান্তি খুব মনোরম হইলেও সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করার মত মাদকতা তাহাতে নাই; আমার প্রাণবল্লভের অঙ্গকান্তি কিন্তু নিজের অনির্কচনীয় শক্তিতে সমস্ত জগৎকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া দেয়। ইহার আরও একটি অদ্ভুত শক্তি এই যে, যে নারী একবার শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রামলকান্তি দর্শন করিবেন—সতী সাক্ষী বলিয়া তাঁহার যতই খ্যাতি থাকুক না কেন—তিনি তৎক্ষণাৎই স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত বিসর্জন দিয়া, নিজাঙ্গ দ্বারা সেবা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে সখী করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িবেন। আর সখি! স্নিগ্ধতায়, চাকচিক্যে,

কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাব্রগর্জিত জিনি,  
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার ।

উঠি ধায় ব্রজজন, তুষিত চাতকগণ,  
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

উল্লাস-জনকস্বে এবং সন্তাপ-হারিস্বে শ্রীকৃষ্ণকান্তির সঙ্গে চন্দ্রজ্যোৎস্নারও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু সখি ! এই শিখিতাদি গুণ চন্দ্রজ্যোৎস্না অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকান্তিতে যে কোটি কোটি গুণে অধিক, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই । তাতে আমার মনে হয়, সখি ! বিধাতার ভাঙারে বুঝি সর্বচিন্তের আনন্দোন্মত্ততা-জনক এমন একটা অনির্বচনীয় কান্তি ছিল—যাহার সঙ্গে ইন্দ্রনীলমণি-কান্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে এবং যাহা তরুণ তমালের কান্তিকেও পরাজিত করিয়া থাকে । এই অনির্বচনীয় কান্তিতে, শৃঙ্গার-রসকে ছাঁকিয়া, তাহার সঙ্গে চন্দের জ্যোৎস্না মিশাইয়া বোধহয় বিধাতা এই অপরূপ কৃষ্ণতত্ত্ব নির্মাণ করিয়া থাকিবেন, সখি !”

৪০ । এক্ষণে “ক মন্দমুরলীরবঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন, দুই ত্রিপদীতে ।

কাহাঁ—কোথায় । নবাব্র—নূতন মেঘ । গর্জিত—গর্জন, ডাক । নবাব্র-গর্জিত জিনি—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, মধুরতায় ও গাঙ্গীর্ষ্যে নূতন মেঘের-ধ্বনিকেও পরাজিত করে । জগদাকর্ষে ইত্যাদি—যাহার (যে মুরলীধ্বনির) শ্রবণে (শ্রবণ করিলে) সমস্ত জগৎ আকৃষ্ট হয় ।

উঠি ধায় ব্রজজন—যে মুরলীধ্বনি শুনিলে ব্রজবাসিগণ তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ কার্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয় । তুষিত চাতকগণ—ব্রজজনরূপ তুষিত চাতক । মেঘের গর্জন শুনিলে বৃষ্টি-পাতের সম্ভাবনা জানিয়া বৃষ্টিধারা পান করিবার নিমিত্ত পিপাসার্ত চাতক যেমন ধাবিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলেও কৃষ্ণবিরহ-কাতর এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবিত (তুষিত) ব্রজবাসিগণ সমস্ত কার্য ত্যাগ করিয়া বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইলেন ।

পিয়ে—পান করে (ব্রজ জন) । কান্ত্যমৃত-ধার—শ্রীকৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত, কান্ত্যমৃত । কান্ত্যমূতরূপ ধারা কান্ত্যমৃতধার । চাতক পক্ষী মেঘের বারিধারা পান করিয়া থাকে ; তাই, চাতকের সঙ্গে ব্রজজনের তুলনা দেওয়ায়, বারিধারার সহিত শ্রীকৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে ।

চাতকের সঙ্গে ব্রজজনের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, চাতক যেমন মেঘের জল ব্যতীত অপর কিছুই পান করে না, ব্রজবাসিগণও শ্রীকৃষ্ণের কান্তি (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ) ব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিয়া তৃপ্তি পাবেন না ।

তুষিত-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মেঘের অভাব হইলে চাতক যেমন পিপাসায় কাতর হইয়া যায়, স্ততরাং মেঘের আগমনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ গোচারণাদির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অগ্ন্য গমন করিলে, ব্রজবাসিগণও তাঁহার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন ।

শ্রীকৃষ্ণকান্তিকে অমৃত (কান্ত্যমৃত) বলার সার্থকতা এই যে, অমৃত সিদ্ধিত হইলে যেমন মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণসঞ্চার হয় ; তদ্রূপ কৃষ্ণকান্তি দর্শন করিলেও, তাঁহার বিরহে মৃতপ্রায় ব্রজবাসিগণের দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হয় ।

“কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি” হইতে “কান্ত্যমৃতধার” পর্য্যন্ত :—“হায় সখি ! কোথায় এখন আর শ্রীকৃষ্ণের সেই মুরলীধ্বনি—যাহার মধুরতা এবং গাঙ্গীর্ষ্যের নিকটে নবমেঘের গর্জনও পরাভূত ! ওঃ ! কি অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্তি ছিল সেই মুরলীধ্বনির ! সমস্ত জগৎকে যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া আসিত ! আর ব্রজজনের কথা কি আর বলিব সখি ! তোমরা তো সমস্তই জান । মেঘের অভাবে চাতক যেমন পিপা সায়



মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,  
সখি ! মোর তেঁহো সুহৃৎসব । বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ঠীকা ।

ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, মেঘোদয়ের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে—গোচারণাদির ব্যাপদেশে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজবাসিগণের দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেন, তখন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরতায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণ যেন তখন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত । আবার নূতন মেঘের গর্জ্জন শুনিলে জলপ্রাপ্তির আশায় তৃষিত চাতক যেমন ঐ গর্জ্জনে লক্ষ্য করিয়াই মেঘের পানে ছুটিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সম্ভাবনায়, উৎকণ্ঠিত ব্রজবাসিগণ বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেন ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেই যেন তাঁহাদের মৃতপ্রায় দেহে পুনর্জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইত—জ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন-সময়ে মক্‌তুমিতে ভ্রমণরত পিপাসার্ত পথিক যেরূপ উৎকণ্ঠার সহিত অকস্মাৎ প্রাপ্ত জল পান করিতে থাকে, তাঁহারাও তদ্রূপ ঔৎসুক্যের সহিত অপলক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন । সখি ! শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে—তৃষিত চাতকের ছায়, মক্‌তুমিতে ভ্রমণরত পথিকের ছায়—শ্রীকৃষ্ণরূপ-সুধার পিপাসায় আমারও প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—সখি ! প্রাণবল্লভের কান্ত্যমৃত পানের সৌভাগ্য আমার কখন হইবে ? কখন আমি সেই মদনমোহনের মোহন-মুরলীধ্বনি শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশে উন্মত্তার ছায় ধাবিত হইব ?”

৪১। কলা—নৃত্যগীতাদি । নিধি—আশ্রয় । কলানিধি—নৃত্যগীতাতির আশ্রয়, নৃত্যগীতাদিতে সর্বাপেক্ষা নিপুণ যিনি ; রাসরসতাণ্ডবী । মোর সেই কলানিধি—সখি ! যিনি নৃত্য-গীতাদি-নিপুণতার আশ্রয়ীভূত, রাসরসতাণ্ডবী আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায় ? ইহা শ্লোকস্থ “ক রাস-রসতাণ্ডবী” অংশের অর্থ ।

প্রাণরক্ষা-মহৌষধি—যিনি আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধি-তুল্য । শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার প্রাণ বহির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলে প্রাণরক্ষার আর অল্প উপায় নাই ; তাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে মহোপকারক ঔষধরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-পীড়ায়, শ্রীকৃষ্ণরূপই একমাত্র ফলদায়ক ঔষধ । ইহা “ক সখি জীবরক্ষৌষধি” অংশের অর্থ ।

সখি ! মোর তেঁহো সুহৃৎসব—সখি ! সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিনি এখন কোথায় সখি ! ইহা শ্লোকস্থ “স মে সুহৃৎসবঃ ক” অংশের অর্থ ।

কোনও কোনও গ্রন্থে মূল শ্লোকের “সুহৃৎসব ক বত” স্থানে “সুহৃৎসব ক তব” পাঠ দিয়া এই ত্রিংশদীতে “মোর তেঁহো সুহৃৎসব” স্থলে “তোর তেঁহ সুহৃৎসব” পাঠ দেওয়া হইয়াছে । “তোর তেঁহ” পাঠস্থলে অর্থ বোধ হয় এইরূপ হইবে—“সখি ! সেই শ্রীকৃষ্ণ তোর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু ; তাই, তুই বোধহয় জানিস্‌ তিনি কোথায় আছেন ; সখি ! আমায় একবার বলিয়া দে, তিনি কোথায় আছেন ।”

এই অংশের মর্ম্ম :—“সখি ! নৃত্যগীতবিশারদ আমার সেই রাসরসতাণ্ডবী প্রাণবল্লভ কোথায় ? তাঁহার বিরহে আমার যে প্রাণ যায়, সখি ! একবার তাঁকে দেখা সখি ! দেখাইয়া আমার প্রাণ বাঁচা সখি ! তাঁকে না দেখিলে আমি আর বাঁচিতে পারি না সখি ! তিনিই আমার জীবনরক্ষার একমাত্র মহৌষধি । সখি ! তোরা তো জানিস্‌ তাঁর মত সুহৃৎ আমার আর কেহই নাই—তাঁহার বিরহে আমার হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তা কি তিনি জানিতে পারেন না, সখি ! তবে কেন তিনি এখনও আমাকে দেখা না দিয়া দূরে বসিয়া আছেন ? কেন একবার আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন না ?”

দেহ—আমার শরীর । জীয়ে—জীবিত থাকে । তাঁহা বিনে—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত । দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে—“যিনি আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র মহৌষধি, তাঁহাকে না পাইয়াও আমার এই দেহ জীবিত আছে ।

যে জন জীতে নাহি চাষ, তারে কেনে জীয়ায়,  
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক ।

বিধির করে ভৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,  
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কি আশ্চর্য্য !” ইহা শ্লোকস্থ “নিধির্মম” অংশের অর্থ । **ধিক্ এই জীবনে**—“আমার এই জীবনেও ধিক্ সখি !” ইহা শ্লোকস্থ “বত হস্ত” অংশের অর্থ । **বিধি করে এত বিড়ম্বন**—“বিধাতা আমার সঙ্গে এত প্রতারণা করেন ! শ্রীকৃষ্ণকে ও আমাকে এমন ভাবেই বিধাতা সৃষ্টি করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আমার জীবন-ধারণই অসম্ভব ; এই অবস্থায়, বিধাতা যদি শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকটে রাখিতেন, তাহা হইলেই বুঝিতাম, বিধাতা আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার করিতেছেন ; অথবা, শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া বিধাতা যদি আমাকে বাঁচিতে না দিতেন, তাহা হইলেও তাঁর সরলতা বুঝা যাইত । কিন্তু আমার জীবন-রক্ষার যিনি একমাত্র মহৌষধ, তাঁহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া নেওয়া, এবং তাঁহাকে সরাইয়া নিয়াও আমাকে জীবিত রাখা—আমি বাঁচিতে ইচ্ছা না করিলেও আমাকে বাঁচাইয়া রাখা—এসমস্ত বিধাতার সরল ব্যবহারের পরিচায়ক নহে ; বুঝিতেছি, আমাকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত করাই বিধাতার অভিপ্রায় । তিনি সৃষ্টিকর্তা, আমি তাঁর সৃষ্টজীব ; আমার সঙ্গে তাঁহার এইরূপ প্রতারণা কি সম্ভব ? ধিক্ বিধিকে ।” ইহা শ্লোকস্থ “ধিধিধিং” অংশের অর্থ ।

**৪২ । জীতে**—জীবিত থাকিতে ; **বাঁচিতে** । **জীয়ায়**—বাঁচাইয়া রাখে । **যে জন জীতে** ইত্যাদি—যে বাঁচিতে ইচ্ছা করে না, **বিধি** তাকে বাঁচাইয়া রাখে কেন ? ইহাকে বিধাতার বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি বলা যায় ।

এই পর্য্যন্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উক্তি । **বিধি প্রতি**—বিধাতার প্রতি । **উঠে ক্রোধ শোক**—বিধাতার প্রতি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর ক্রোধ এবং কৃষ্ণ-বিরহে শোক । নিজের প্রতি বিধাতার বিড়ম্বনার কথা ভাবিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বিধাতার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত শোকে অত্যন্ত অভিভূত হইলেন ।

“বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধশোক” ইহা গ্রন্থকারের উক্তি ।

**বিধিরে করে ভৎসন**—বিধাতা তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতেছেন বলিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন । বিধাতাকে কিরূপে তিরস্কার করিলেন, তাহা নিম্নোক্ত “অহো বিধাতঃ” ইত্যাদি শ্লোক এবং তৎপরবর্তী ত্রিপদী-সমূহে কথিত হইয়াছে ।

**ওলাহন**—প্রণয়-মূলক যুহুভৎসন । **কৃষ্ণে দেয় ওলাহন**—“যিনি আমার প্রাণবল্লভ, যিনি কতকাল আমার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ আমার প্রতি এরূপ নির্ধুরতা করিলেন ? স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি যাকে স্ত্রী করার জন্ত ব্যস্ত, সেই কৃষ্ণ নিজ হাতে আমাকে মারিতে উত্তম ?”—ইত্যাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগিলেন । পরবর্তী ত্রিপদী-সমূহে ওলাহনের কথাগুলি দেওয়া আছে ।

**পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক**—নিম্নোক্ত “অহো বিধাতঃ” ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকটি পড়িয়া প্রলাপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বিধাতাকে ভৎসনা করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগিলেন ।

কেহ কেহ বলেন “ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু” ইত্যাদি প্রলাপটি চিত্রজন্মের অন্তর্গত পরিজন্মের দৃষ্টান্ত । আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না । কারণ, ইহাতে চিত্রজন্মের সাধারণ লক্ষণ নাই । ( ৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য । ) আবার ইহাতে পরিজন্মের বিশেষ লক্ষণও নাই ; পরিজন্মে শ্রীকৃষ্ণের নির্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদির প্রতিপাদন এবং শ্রীরাধার নিজের বিচক্ষণতার প্রকাশ থাকে ( উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪২ ) । উক্ত প্রলাপে এসমস্ত কিছু নাই—আছে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির স্বরূপে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা এবং তাঁহার বিরহেও শ্রীরাধা বাঁচিয়া রহিয়াছেন বলিয়া নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার । এই প্রলাপে দিব্যোন্মাদের ভ্রামাভা-বৈচিত্রীও দেখা যায় না । ইহা মোহনাথ্য ভাবের অপর একটা বৈচিত্রী বলিয়াই মনে হয় ।

তথাহি ( ভাঃ ১০।৩৯।১০ )—

অহো বিধাতন্তব ন কচিদ্দয়া

সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।

তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনক্ত্যপার্থকং

বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতিং বিধায় বিঘটয়তীতি বিধাতারং প্রত্যোবমাক্রোশন্ত্য। আহঃ অহো ইতি । মৈত্র্যা হিতাচরণেন প্রণয়েন য়েহেন চ । অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্তভোগানপি বিযুনক্তি বিযোজয়সি তস্মান্নতাবদয়া বালিশোহপিভ্রম ইত্যাহঃ অপার্থকমিতি । স্বামী । ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ৩। অর্থঃ । অহো ( অহো কি আশ্চর্য্য ) ! বিধাতঃ ( হে বিধাতঃ ) ! তব ( তোমার ) কচিং ( কোথাও ) দয়া ন ( দয়া নাই ), [ যতঃ ] ( যেহেতু ) মৈত্র্যা ( মৈত্রীদ্বারা ) প্রণয়েন ( প্রণয়দ্বারা ) দেহিনঃ দেহীদিগকে, ( জীবদিগকে ) সংযোজ্য ( সংযুক্ত করিয়া ) অকৃতার্থান্ তান্ ( তাহারা কৃতার্থ না হইতেই, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তাহাদিগকে ) বিযুনক্তি ( বিযুক্ত কর তুমি ); তে ( তোমার ) বিচেষ্টিতম্ ( চেষ্টা, কার্য্য ) অর্ভকচেষ্টিতম্ ( বালকের চেষ্টার তায় ) : অপার্থকম্ ( অর্থশূন্য ) ।

অনুবাদ । গোপীগণ বলিলেন—অহো কি আশ্চর্য্য ! হে বিধাতঃ ! কোথাও তোমার দয়ার লেশমাত্র নাই ; যেহেতু, মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা জীবগণকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তুমি তাহাদিগকে বিযুক্ত কর । বুঝিলাম, তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার তায় অর্থশূন্য । ৩

অত্র ব্রজে আসিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্ত । ব্রজসুন্দরীগণ তাহা জানিতে পারিলেন ; জানিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহের আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িলেন । তাঁহারা তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্ত বিধাতাকেই দোষী মনে করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথায় তাঁহাকে ভৎসনা করিতেছেন ।

হে বিধাতঃ ! কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র দয়াও তোমার নাই ; তাহার প্রমাণ দিতেছি, শুন । মৈত্রীদ্বারা বা প্রণয়দ্বারা তুমি লোকদিগকে একত্রিত ( মিলিত ) কর । তোমার এই আচরণকে হয়তো তোমার দয়ার কার্য্য বলিয়াই তুমি মনে করিবে ; যেহেতু তুমি বলিবে—তাহাদিগকে মিলিত করিয়া মিলন-সুখ উপভোগের সুযোগ তুমি তাদের করিয়া দিলে । কিন্তু কার্য্যের শেষটা দেখিয়াই উদ্দেশ্যের বা প্রবর্তক-বাসনার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয় । তোমার কার্য্যের শেষটা দেখিলে প্রেম-মৈত্রী দ্বারা লোকের একত্রীকরণকেও তোমার দয়ার কার্য্য বলিয়া মনে করা যায় না । কারণ, দেখা যাইতেছে—লোকদিগকে প্রেম-মৈত্রীদ্বারা একত্রিত করিয়াও, তাহাদিগকে মিলন-সুখ উপভোগ করার সুযোগ দিয়াও—তুমি তাহাদিগকে মিলনসুখ ভোগ করিতে দাও না ; সুখ-ভোগের আরম্ভেই, তাহাদের ভোগবাসনা পূর্ণ না হইতেই অকৃতার্থান্ তান্—তাহারা অকৃতার্থ থাকিতেই, সুখভোগে তাহাদের কৃতার্থতা—সার্থকতা লাভ করার পূর্বেই তুমি তাহাদিগকে বিযুনক্তি—বিযুক্ত কর, পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লও ; ইহা কি তোমার দয়ার কাজ ? পিপাসাতুর লোকের হাতে জলপাত্র দিয়া, যখনই সে তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করাইয়াছে, তখনই তাহার হাত হইতে জলপাত্র কাড়িয়া নেওয়া কি দয়ার কাজ ? ইহা অপেক্ষা নিম্নমতা আর কি হইতে পারে ? কৃষ্ণের সহিত তুমি আমাদের মিলন ঘটাইয়াছ ; কিন্তু কয়দিনের জন্ত ? সবেমাত্র আমরা মিলনানন্দ উপভোগ করিবার উত্তোগ করিতেছি—তখনই তুমি অত্রুরূপে পাঠাইয়া আমাদের সামিধ্য হইতে কৃষ্ণকে দূরে সরাইয়া নিতেছ ? বিধি ! পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে তুমি জান না । বালক যেমন যখন যাহা মনে আসে, তাহাই তখন করিয়া থাকে—ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করে না, তোমার অবস্থাও তদ্রূপ । বালকের কার্য্যের যেমন কোনও উদ্দেশ্য বা অর্থ থাকে না, তোমার কার্য্যও তদ্রূপ ; তোমার বিচেষ্টিতং—চেষ্টা, কার্য্য অর্ভক-

অন্ত্যর্থঃ যথারাগঃ—

না জানিস্ প্রেম-ধর্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,  
তোর চেষ্ঠা বালক-সমান ।

তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,  
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

**চেষ্টিতম্**—অর্ভকের (বালকের, শিশুর) চেষ্ঠার স্থায় **অপার্থক**—অপগত হইয়াছে অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহা হইতে ; উদ্দেশ্যহীন, অর্থশূন্য । **অহো**—কি আশ্চর্য্য ! তুমি বিধাতা, জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা ; অথচ তোমার একরূপ আচরণ ! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

পরবর্তী ত্রিপদী-সমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে ।

৪৩ । এই ত্রিপদীসমূহে “অহো বিধাতঃ” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্ত অক্রুর যখন ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই গোপীগণ “অহো বিধাতঃ” ইত্যাদি শ্লোকে বিধাতাকে নিন্দা করিয়াছিলেন । সেই সময়ে গোপীদিগের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই ভাবের আবেশেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটী পড়িয়া প্রলাপে তাহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছিলেন । উক্ত শ্লোক-কখনকালে গোপীদিগের ছিল শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহের—শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের সঙ্গে চলিয়া গেলে তাঁহাদের যে দুঃখ হইবে, সেই ভাবী দুঃখের আশঙ্কার ভাব ; কিন্তু পরবর্তী ত্রিপদীসমূহ হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন পরে গোপীদের বা শ্রীরাধার মনে যে ভাব জন্মিয়াছিল, তখন শ্রীরাধা যে ভাবের বশীভূত হইয়া বিধাতাকে ভৎসনা করিতেছিলেন, সেই ভাবের আবেশেই উক্ত শ্লোকোক্ত কথায় প্রভুও বিধাতাকে তিরস্কার করিয়াছেন । সম্ভবতঃ অক্রুরের আগমনে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন নিশ্চিত জানিয়া কৃষ্ণ-বিরহকে নির্দারিত মনে করিয়া ভাবী বিরহকেই বর্তমানতুল্য জ্ঞানে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু একরূপ বলিয়াছেন ।

“বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা” এই অংশের অর্থ করিতেছেন “না জানিস্” ইত্যাদি বাক্যে ।

**না জানিস্**—বিধি তুই জানিস্ না । বিধাতার নিজের কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অক্ষমতা বিবেচনা করিয়া ক্রোধবশতঃ বিধাতার প্রতি তুচ্ছার্থবোধক “জানিস্”-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । **প্রেম-ধর্ম**—প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব । **ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম**—বিধি, অজ্ঞতাবশতঃ তুই তোর পরিশ্রমকে ব্যর্থ করিতেছিস্ । তুই প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বই জানিস্ না ; অথচ প্রেমিক-যুগলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিধানও করিতেছিস্ ; কিন্তু তোর অজ্ঞতাবশতঃ তোর বিহিত বিধান প্রেমিক-যুগলের প্রেমের প্রতিকূলই হইতেছে ; তাতে, প্রেমিক-যুগলের আচরণের বিধান-প্রণয়নে তুই যে পরিশ্রম করিয়াছিস্, তাহা সম্যক্রূপে ব্যর্থই ( নিষ্ফল ) হইতেছে ।

**তোর চেষ্ঠা বালক-সমান**—বিধি, তোর চেষ্ঠা অজ্ঞ-বালকের চেষ্ঠার তুল্যই নিরর্থক হইতেছে । কিরূপে ঘর তৈয়ার করিতে হয়, বালক তাহা জানে না । না জানিলেও, বালক নিজের খেলালমত খেলার ঘর তৈয়ার করে এবং তাহাকে রক্ষা করার জন্ত চেষ্ঠা করে ; কিন্তু তাহার অজ্ঞতাবশতঃ তাহার কোনও কার্য্যই তাহার ঘর রক্ষার অনুকূল হয় না, ফলতঃ তাহার ঘরখানা পড়িয়াই যায়, বাসের উপযোগী হয় না । সুতরাং বালকের সমস্ত পরিশ্রমও বৃথা হইয়া যায় । বিধাতঃ, প্রেমিক-যুগলের পরিচালনার্থ বিধান-প্রণয়নে তোর পরিশ্রমও বালকের গৃহ-রক্ষণে পরি-  
শ্রমের স্থায়ী ব্যর্থ ।

**তোর যদি লাগ পাইয়ে**—যদি তোকে ( বিধিকে ) আমার নিকটে পাইতাম । তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে—তাহা হইলে তোকে আমি রীতিমত শিক্ষা দিয়া দিতাম ( উপযুক্ত শাস্তি দিতাম ) । **এমন যেন না করিস্ বিধান**—যাতে তুই আর কখনও প্রেমিক-যুগলের নিমিত্ত এইরূপ অদ্ভুত বিধান না করিস্ । তোকে এমন শাস্তি দিতাম, যাহার ভয়ে তুই ভবিষ্যতে আর এমন গর্হিত কর্ম্ম করিতিস্ না । **বিধান**—ব্যবস্থা, যাতে প্রেমিক-যুগল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, এমন অকরুণ বিধান ।

অরে বিধি ! তৌ বড় নিষ্ঠুর ।  
অন্তোন্তদুর্লভ জন, প্রেমে করাঞা সন্মিলন,  
অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর ? ॥ ধ্রু ॥ ৪৪

অরে বিধি ! অকরণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,  
নেত্র-মন লোভাইলি আমার ।  
ক্ষণেক করিতে পান, কাটি নিলি অন্তস্থান,  
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-ভরসিঙ্গী টীকা ।

“না জানিস্” হইতে “করিস্ বিধান” পর্য্যন্তঃ—বিধাতার কার্য্য-কলাপে রুষ্ট হইয়া শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভু বিধাতাকে ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন :—“বিধি ! তোর ধ্বংসা দেখিয়া ক্রোধে শরীর যেন জলিয়া যাইতেছে । যে যে-বিষয়ের বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ করিবে, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত দরকার । তুই প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিস্ না ; অথচ, তোর এতবড় ধ্বংসা যে, তুই প্রেমিক-যুগলের পরিচালনের নিমিত্ত—প্রেমিক-যুগল পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তদ্বিষয়ক—বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছিস্ !! তোর এই অজ্ঞতামূলক-ধ্বংসতার ফল হইতেছে এই যে, তোর বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই প্রেমের প্রতিকূল হইতেছে । প্রেমিক-যুগলকে যদি প্রেমের অনুকূল অবস্থায়—একই সঙ্গে—রাখার ব্যবস্থা করিতে পারিতিস্, তাহা হইলেই বিধি-প্রণয়নের পরিশ্রম তোর সার্থক হইত । কিন্তু তোর ব্যবস্থার ফলে প্রেমিক-যুগল পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপরিণীম দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে—প্রেমের প্রতিকূল অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে । প্রিয়ের বিরহে প্রিয়া কখনও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে না—সে প্রাণত্যাগ করিতেই উৎকণ্ঠিত হয়—ইহাই প্রেমের অনুকূল অবস্থা ; কিন্তু তোর উন্টা বিধির ফলে কাস্তকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও কাস্তাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় !! ধিক্ তোর বিধিকে, আর ধিক্ বিধি তোকে ! গৃহনির্মাণের এবং গৃহরক্ষার কৌশলে অনভিজ্ঞ বালকের চেষ্টায় যেমন তাহার নির্মিত গৃহ কখনও বাসের উপযোগী এবং স্থায়ী হইতে পারে না, স্ততরাং বালকের অজ্ঞতার ফলে, গৃহ-রক্ষাব্যপারে তাহার সমস্ত চেষ্টাই যেমন ব্যর্থ হইয়া যায়, প্রেমিক-প্রেমিকার পরিচালনার্থ বিধি-প্রণয়নে—প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব সম্যক্রূপে অনভিজ্ঞ তোর চেষ্টাও তদ্রূপ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে । যদি তোকে আমি কখনও একবার আমার নিকটে পাইতাম, তাহা হইলে তোকে এমন শিক্ষা ( উপযুক্ত শাস্তি ) দিতাম যে, ভবিষ্যতে তুই আর কখনও প্রেমিক-প্রেমিকার জন্ত এমন অদ্ভুত বিধি প্রণয়ন করিতে সাহস করিতিস্ না ।”

৪৪। তৌ—তুমি, তুই । নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর, নির্দয় । অরে বিধি ! তৌ বড় নিষ্ঠুর—রে বিধি ! তুই অত্যন্ত নিষ্ঠুর । ইহা “অহো বিধাতন্তব ন কচিদ্দয়া” অংশের অর্থ । অন্তোন্তদুর্লভ জন—যাঁহারা পরস্পরের পক্ষে দুর্লভ, এমন দুইজনকে । শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দুর্লভ, আবার শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার পক্ষে দুর্লভ ; যেহেতু, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরনারী । এই অবস্থায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে “অন্তোন্তদুর্লভ জন” বলা হয় । দুর্লভ—সহজে যাহা লাভ করা যায় না । প্রেম-ব্যতীত অত্র উপায়ে দুর্লভ । প্রেমে করাঞা সন্মিলন—প্রেমের দ্বারা অন্তোন্ত দুর্লভজনকে সন্মিলিত করিয়া । অকৃতার্থান্—অপূর্ণবাসনা ; তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গ-বাসনা পূর্ণ না হইতেই । কেনে করিস্ দূর—প্রেমের প্রভাবে সন্মিলিত অন্তোন্ত-দুর্লভজনকে কেন পরস্পরের নিকট হইতে দূর (বিচ্ছিন্ন) করিস্ ?

“বিধি ! তুই যে কেবল অজ্ঞ এবং ধ্বংস, তাহাই নহে, তুই নিতান্ত নিষ্ঠুরও ; তোর প্রাণে দয়া-মায়ী নাই । তাহাই যদি না হইবে, তবে প্রেমব্যতীত অত্র কোনও উপায়েই যাঁহাদের পরস্পরের সহিত সন্মিলনের কোনও সম্ভাবনাই নাই, এমন দুইজনকে প্রেমের দ্বারা সন্মিলিত করিয়া—পরস্পরের সঙ্গে তাঁহাদের অভীষ্ট সন্তোগাদি শেষ না হইতেই—তুই তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলি কেন ? এমন নিষ্ঠুর তুই ?”

“অন্তোন্তদুর্লভ” ইত্যাদি “সংযোজ্য মৈত্র্যা………বিযুক্ত্যপার্থক্যং” অংশের অর্থ ।

৪৫। প্রেমের দ্বারা তাঁহাদের সংযোগ করিয়া কিরূপে বিধি আবার তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন ।



‘অক্রুর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ, | তুঞি অক্রুরমূর্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি,  
ইহা যদি কহ ছুরাচার । | অন্নের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-ভরসিগী টকা ।

**অকরণ**—করণাশূন্য, নির্ভর । **কৃষ্ণানন**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ । **নেত্র-মন** লোভাইলি আমার—আমার মননের ও মনের লোভ জন্মাইলি । **শ্রীকৃষ্ণের** বদনমাধুর্য্য দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়নের এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত আমার মনের লোভ জন্মাইলি । **শ্রীকৃষ্ণের** প্রতি আমার প্রেম জন্মাইলি—যেই প্রেমের দ্বারা তুই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার মিলন করাইলি । এতলে, পূর্ব্বত্ৰিপদী-প্রোক্ত “প্রেমে করাএয়া সন্মিলন” অংশ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন ।

এক্ষণে কিরূপে “অকৃতার্থ-প্রেমিক-যুগলকে বিচ্ছিন্ন” করিয়া বিধাতা নিজের নির্ভরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে ।

**ক্ষণেক করিতে পান**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পরে তাঁহার বদন-চন্দ্রের সূখা অল্পক্ষণ মাত্র পান করার পরেই ; ইচ্ছামত তাঁহার বদন-সুখা ( বা সঙ্গ-সুখা ) পান করার পূর্বেই । **কাড়ি নিলি অন্ন স্থান**—বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকট হইতে অন্ন স্থানে লইয়া গেলি । **দত্ত-অপহার**—কোনও বস্তু একবার দিয়া পুনরায় তাহা কাড়িয়া নেওয়াকে দত্ত-অপহার বলে । ইহা একটি পাপ । **পাপ কৈলে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে তুই একবার আমাকে দিলি ; দিয়াই আবার অল্পক্ষণ পরে কাড়িয়া নিলি ; ইহাতে যে তোর কেবল নির্ভরতা হইয়াছে, তাহাই নহে ; দত্তাপহার-জনিত পাপও তোর হইয়াছে । তুই নির্ভর, তুই পাপী ।

“অরে বিধি” হইতে “দত্ত অপহার” পর্য্যন্ত :—রে নির্ভর বিধি ! আমি তো পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও দেখি নাই, তুই মধ্যে না আসিলে কখনও দেখিতাম কিনা, তাও বলিতে পারি না । তুই তোর পোড়া বিধানের বলে, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের অসমোক্তমাধুর্য্যমণ্ডিত মুখখানা দেখাইলি—দেখাইয়া, সেই অদ্বুত মাধুর্য্যপূর্ণ মুখখানা আরও দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়নের লোভ জন্মাইলি—তাঁহার সঙ্গলাভের নিমিত্ত আমার মনে বলবতী বাসনা জন্মাইলি ; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার এবং আমার প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম জন্মাইলি ; প্রেম জন্মাইয়া সেই প্রেমের প্রভাবে আমাদের সন্মিলিত করিলি । আমাদের পরস্পরের সহিত দেখা না করাইলে, আমাদের প্রাণে পরস্পরের প্রতি তুই প্রেম না জন্মাইলে, আমাদের মিলনই অসম্ভব হইত ; পরস্পরকে দেখিবার ইচ্ছাও হয়ত আমাদের মনে জাগিত না । প্রেম জন্মাইয়া তুই আমাদের সন্মিলিত করিলি । ভাবিয়াছিলাম, মিলনানন্দের আমাদের জীবন অতিবাহিত হইবে কিন্তু রে অকরণ বিধি, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আমরা সবে মাত্র পরস্পরের সঙ্গ-সুখ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি,—এমন সময়—যখন পর্য্যন্ত, আমি যথেষ্টরূপে আমার প্রাণ-বল্লভের পরিহাস-বাক্য শ্রবণ করিতে পারি নাই, নির্ভয়ে তদীয় মুখ-কমলের মনোহর কান্তি সন্দর্শন করিতে পারি নাই, আমাকর্তৃক তাঁহার বিশাল বক্ষঃও গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হয় নাই—তখনই—আমাদের আশা না পূরিতেই—তুই তোর নির্ভর হস্তে আমার প্রাণ-বল্লভকে বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে কাড়িয়া নিয়া বহুদূরে সরাইয়া দিলি ! কেনই বা দিলি ! আবার, দিয়া কেনই বা নিলি ? দেওয়া জিনিস কাড়িয়া নিলি, বিধি, তোর যে দত্তাপহারজনিত পাপ হইল রে ! দারুণ বিধি ! তুই যে কেবল নির্ভর, তাহাই নহে ; তুই মহাপাপীও বটস্ ।

৪৬ । “অক্রুর করে” হইতে “ঐছে ব্যবহার” পর্য্যন্ত ত্ৰিপদীর অর্থ :—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিধাতাকে বলিলেন, “রে ছুরাচার ! তুই যদি বলিস্—অক্রুর তোমার ( কথিত ) দোষ করিয়াছে, তুমি আমায় রোস করিতেছ কেন ?—তবে আমি বলি ওন্—তুই-ই অক্রুরের মূর্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করিয়া নিয়াছিস্, অন্ন কাহারও এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে না ।”

আপনার কর্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,  
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর ।

যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার মাথ,  
সেই কৃষ্ণ হইল নিষ্ঠুর ॥ ৪৭

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অক্রুর করে তোমার দোষ—রাধে ! আমি ( বিধাতা ) নির্দয় বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে অপহরণ করিয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে যে দোষ দিতেছ, সেই দোষ তো বাস্তবিক আমি করি নাই ; অক্রুরই সেই দোষ করিয়াছেন, অক্রুরই নির্দয়ের ঠায় তোমার নিকট হইতে তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, আমি নেই নাই ।

আমায় কেনে কর রোষ—রাধে ! তুমি আমাকে দোষী মনে করিয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইতেছ কেন ?

“অক্রুর করে.....রোষ”—ইহা বিধাতার উক্তি বলিয়া শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিয়া লইতেছেন ।

ইহা—অক্রুর করে ইত্যাদি ।

দুরাচার—দুষ্ট আচার সাহার ; নির্দয় ও দস্তাপহারী ; ইহা বিধাতার প্রতি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর রোষোক্তি ।

তুঞি অক্রুরমূর্তি ধরি—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন,—বিধি ! যিনি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আকৃতি ঠিক অক্রুরের আকৃতির মতনই ; কিন্তু তিনি অক্রুর নহেন ; অক্রুর নির্দয় হইতে পারেন না ; তাঁহার ( অক্রুর—অ-নির্দয়—কপাল ) নামই তাহা স্মৃতি করিতেছে । তুই-ই অক্রুরের মূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করিয়া নিয়াছিস্ । **অন্যের নহে এঁছে ব্যবহার**—এইরূপ নির্দয় আচরণ অপরের হইতে পারে না, ইহা তোরই আচরণ ।

“রে দুরাচার বিধি ! তুই হয়তো বলিবি যে, তুই কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরায় লইয়া যাস্ নাই ; অক্রুরই লইয়া গিয়াছেন । তোর মতন দুরাচার প্রতারকের পক্ষে, নিজে দোষ করিয়া সেই দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া অসম্ভব—অস্বাভাবিক—নহে । অক্রুর তোর মতন নির্দয় নহেন, অক্রুরের নাম শুনিলেই বুঝা যায়, তিনি ক্রুর ( নিষ্ঠুর ) নহেন । আর বিধি, তোর নাম শুনিলেই বুঝা যায়, তোর শরীরে মায়া-মমতা নাই—তুই তোর বিধান-অনুসারে কাজ করিবিই, তাতে অপরের প্রাণান্তক কষ্ট হইলেও সেই কষ্ট তোকে তোর বিধান হইতে একটুও বিচলিত করিবে না—কাহারও অবস্থা দেখিয়া তোর চিত্ত বিচলিত হইলে তোর বিধানের মর্যাদাই যে তুই রক্ষা করিতে পারিবি না—স্বয়ং বিধান-কর্তা হইয়া তুই কিরূপে তোর বিধান লঙ্ঘন করিবি ? তাতেই তোকে মায়া-মমতায় উপেক্ষা করিয়া নির্দয় হইতে হয় । নির্দয়তাসূত্রে অক্রুরের কথা তো দূরে, অপর কাহারও পক্ষেও এইরূপ নির্দয়-ব্যবহার সম্ভব নহে ; কারণ, অপর কেহই তোর মত বিধাতা নহে । আমাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকে অক্রুর লইয়া যানেন নাই ; তবে হাঁ, যিনি লইয়া গিয়াছেন, তাঁর আকৃতিও ঠিক অক্রুরের আকৃতির মতনই এবং তিনি অক্রুর বলিয়া নিজের পরিচয়ও দিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তথাপি তিনি বাস্তবিক অক্রুর নহেন—অক্রুর এমন ক্রুর হইতে পারেন না । প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বশতঃ আমাদের জন্ম তুই যে অদ্ভুত প্রেম-প্রতিকূল বিধান করিয়াছিলি, সেই অদ্ভুত বিধানের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে তুইই অক্রুরের রূপ ধরিয়া আসিয়া আমাদের প্রাণ-কোটিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিস্, নিজের নির্দোষতা-খ্যাপনের নিমিত্তই তুই অক্রুরের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিস্ ।”

৪৭। উপরোক্তভাবে বিধাতাকে ভৎসনা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বোধহয় ক্ষণকাল একটু চিন্তা করিলেন ; চিন্তার ফলে তৎক্ষণাৎই আবার বলিলেন—“না বিধি ! আমি বোধহয় বুঝাই তোর উপর রুষ্ট হইয়াছি ; অনর্থকই তোকে তিরস্কার করিতেছি । তুই হইলি বিধি—জীবের কর্মফল-অনুসারে তাহার সুখ-দুঃখের বিধান করাই তোর কর্তব্য ; আমি নিশ্চয়ই ইহজন্মে কি পূর্বজন্মে এমন কোন কর্ম করিয়া থাকিব, যাহার ফলে আমাকে এই বন্ধু-বিরহ-জনিত প্রাণান্তক কষ্টভোগ করিতে হইতেছে ; আমার কর্মদোষেই তুই আমার জন্ম

সব তেজি ভজি যারে,      সেই আপন-হাথে মারে,      তার লাগি আমি মরি,      উলটি না চাহে হরি,  
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় ।      ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-ভরস্বিনী টীকা।

এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি, তাতে তোরই বা কি দোষ? তুই তোর কর্তব্যই করিয়াছিস। আমার দুঃখ দেখিয়া আমার প্রতি করুণা দেখাইবার শক্তিও তোর নাই, তাতে তোর কর্তব্যের অবহেলা হইত, তুই যে বিধি। আর বিধাতা না হইলেও আমার প্রতি করুণা দেখাইবার হেতুও বোধহয় তোর কিছু নাই; কারণ, তোর সঙ্গে আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধতো নাই; যাদের মধ্যে কোনওরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাদের মধ্যেই একজনের দুঃখে আর একজনের মনে করুণার উদ্রেক হইতে দেখা যায়; কিন্তু তোর সঙ্গে আমার এরূপ কোনও সম্বন্ধতো নাই। তোর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তাহা অত্যন্ত দূর সম্বন্ধ—তুই কর্মফলদাতা বিধাতা, আর আমি কর্মফলভোগী জীব; এত দূরবর্তী সম্পর্ক যাদের মধ্যে, তাদের মধ্যে একজনের দুঃখে অপরের মনে করুণার উদয় হওয়া সম্ভব নহে।”

**ভোয় মোয়**—তোতে (বিধাতাতে) আর আমাতে; তোর সঙ্গে আমার সঙ্গে। “তোর আমার” এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

**সম্বন্ধ**—সম্পর্ক।

**বিদূর**—বিশেষরূপে দূরবর্তী, ঘনিষ্ঠ নহে যাহা। তুই (বিধাতা) কর্মফলদাতা, আর আমি কর্মফলভোগী; ইহাই আমার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ, ইহা ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ নহে। যাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, সর্বদাই তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, ভাবের আদান-প্রদান হয়; তাহার ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মে; একের সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ জন্মে। কিন্তু বিধাতার সঙ্গে জীবের এরূপ কোনও সম্বন্ধই নাই। (লীলারস পুষ্টির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীরাধিকাদি নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই নর-লীলার আবেশে নিজেদিগকে জীব বলিয়া মনে করিতেছেন। তাই শ্রীরাধিকা নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“কৃষ্ণকৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, সখি তোর এ ব্যর্থ বচন। জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল, ততদিন জীবে কোনজন ॥ শত বৎসর পর্যন্ত জীবের জীবন অন্ত, এই বাক্য কহনা বিচারি। ২১।২২-২৩॥”)। **যে আমার প্রাণ-নাথ**—যে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ। **একত্র রহি যার সাথ**—যাঁর সঙ্গে সর্বদা একত্র অবস্থান করি। **নিষ্ঠুর**—নিষ্ঠুর, নির্দয়।

“শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ; সর্বদা তাঁহার সঙ্গে আমি একত্র অবস্থান করি; সর্বদা আমরা পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান করি; নন্দীলাপে আমরা এমনি ভাবে তন্ময় হইয়া যাই যে, অতঃপর কোনও অনুসন্ধানই থাকেনা, কত সময় যে কাটিয়া গেল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না—আমার মরম তিনি জানেন, তাঁর মরম আমি জানি; কিসে আমার দুঃখ হয়, তাহা তিনি জানেন; কিসে তাঁহার দুঃখ হয়, তাহাও আমি জানি। তিনি কখনও আমাকে দুঃখ দেন নাই—দেওয়ার ইচ্ছাও তাঁর থাকিতে পারে না—এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে আমার। কিন্তু সেই কৃষ্ণই যদি এত নিষ্ঠুরতা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে—বিধি, তুই—তোর সঙ্গে আমার এমন কোনও সম্বন্ধ নাই—তুই যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইবি, ইহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি?”

এই ত্রিপদী হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওলাহন আরম্ভ হইয়াছে।

৪৮। “সব তেজি” ইত্যাদি ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা দেখাইতেছেন।

**সব তেজি**—সমস্ত ত্যাগিয়া; স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া। **ভজি যারে**—যাঁহাকে (যে কৃষ্ণকে) ভজি, (সেবা করি)। **যাঁহাকে সখী করার নিমিত্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করি**। **আপন-হাথে**—নিজহাতে। **মারে**—প্রাণবধ করে। **নারীবধে** ইত্যাদি—স্ত্রীলোককে বধ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের ভয় শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দৈব-দোষ,  
পাকিল মোর এই পাপফল ।  
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাদীন, তারে কৈল উদাসীন,  
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ ৪৯

এইমত গৌরবায়, বিষাদে করে 'হায় হায়',  
হাহা কৃষ্ণ ! তুমি গেলা কতি ? ।  
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,  
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

নাই । তাঁর লাগি—তঁাহার (শ্রীকৃষ্ণের) জন্ম । তঁাহার বিরহে । উলটি না চাহে—ফিরিয়াও চাহে না ।  
হরি—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন ।

ক্ষণমায়ে ভাঙ্গিল প্রণয়—অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গ করিলেন । তাঁর সঙ্গে আমার এত কালের  
এত প্রণয় ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যেই, চক্ষুর নিমিষেই, ইচ্ছামাত্রেই সেই প্রণয়ের কথা  
ভুলিয়া গেলেন—যেন তাঁর সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই নাই বা কোনও দিন ছিলও না, এমন ভাবেই তিনি চলিয়া  
গেলেন ।

এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের প্রতি ওলাহন বাক্য ।

“সব তেজি” হইতে “ভাঙ্গিল প্রণয়” পর্য্যন্ত :—“শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছি—  
লোকধর্ম, বেদধর্ম, স্বজন-আর্য্যপথ সমস্ত বিসর্জন দিয়াছি । আমি কুলবধু, রাজার নন্দিনী—কিন্তু সমস্ত ভুলিয়া, দেহ-  
মন-প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি ; নিজের দেহকে মনকে তাঁর ক্রীড়া-পুতলি করিয়াছি—তাঁর প্রীতিবিধানের  
উদ্দেশ্যে । যাহা অপেক্ষা অধিকতর কলঙ্ক কুলবতীদিগের আর হইতে পারে না, অমানবদনে আমি তাহাই মাথায়  
লইয়াছি, ঘর ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি—কেবলমাত্র তাঁকে সুখী করার নিমিত্ত । কিন্তু হায় ! তিনি কি করিলেন ?  
তিনি এখন নিজ হাতেই আমাকে বধ করিলেন ! তিনি জানেন—তিনিই আমার জীবাত্ম ; তিনি জানেন—তঁাহার  
বিরহে আমার প্রাণধারণ অসম্ভব । কিন্তু এসব জানিয়াও তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—দেখিতেছি,  
নারীবধেও তঁাহার ভয় নাই । তাঁর জন্ম আমি প্রাণে মরিতেছি—“হা প্রাণবল্লভ” বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণ  
ফাটাইতেছি—তিনি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না ! হায় হায় ! যে প্রণয়ে তিনি আমাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন,  
নয়নের পলকেই তিনি সেই প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ! তিনি আমার প্রাণ-মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন !”

৪৯ । আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—“না না ; কৃষ্ণের প্রতি কেন বৃথা রুষ্ট  
হইতেছি ; তাঁর কোনও দোষ নাই—দোষ আমার অদৃষ্টের ; হয়তো আমি কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছি, সেই  
পাপের ফল এখন আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে । কৃষ্ণের কোনও দোষ নাই—তিনি তো আমার প্রেমের অধীনই  
ছিলেন—ইহা রাস-রজনীতে তিনি নিজ যুগেই স্বীকার করিয়াছেন ; তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে  
পারেন না ; আমার প্রবল দুর্ভাগ্যই আমার প্রতি তঁাহাকে উদাসীন করিয়াছে, আমার সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ।  
আমার প্রতি আমার প্রাণবল্লভের যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল, অল্প দুর্ভাগ্য তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহে  
—তঁাহার অনুরাগ অপেক্ষাও আমার বলবন্তর দুর্ভাগ্য, আমি হইতে তঁাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ।” (পূর্ববর্তী ৪৭  
ত্রিপদীর টীকায় “বিদূর” শব্দের ব্যাখ্যার শেষভাগে বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ দ্রষ্টব্য) ।

৫০ । এই মত—পূর্বোক্তরূপে । বিষাদে—৩।১।৪৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য । কতি—কোথায় । বিষাদে  
প্রভু “হায় হায়” করিতে লাগিলেন, আর কেবল বলিতে লাগিলেন—“হা হা কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় গেলে ?”  
গোপীভাব হৃদয়ে—প্রভুর চিত্তে গোপীভাবের আবেশ । তার বাক্য বিলপয়ে—বিলাপ করিয়া প্রভু তার  
( গোপীর ) বাক্যই ( কথাই ) বলিতে লাগিলেন ।

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি—অক্রুরের রথে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন তঁাহার  
বিরহ-বিধুরা গোপীগণ “গোবিন্দ-দামোদর মাধব” ইত্যাদি বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন । গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভুও

## গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

তাহাদের উচ্চারিত “গোবিন্দ-দামোদর-মাধবেতি” বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ‘গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি,’ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশুকোক্ত একটি শ্লোকের অংশঃ—“এবং ক্রবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজজিয়ঃ কৃষ্ণবিসক্তমানসাঃ । বিমূঢ়া লজ্জাং রুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ-দামোদর-মাধবেতি ॥ ১০।৩৯।৩১ ॥” অকুরের রথে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন দেখিয়া, নিজেদের বিরহ-দুঃখের হেতুভূতরূপে প্রথমে বিধাতাকে, তারপর শ্রীকৃষ্ণকে, তারপর নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দিতে দিতে ব্রজগোপীগণ যখন মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত গমনোত্তমতা হইলেন, তখন স্তম্ভাদি-বশতঃ গমনে অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র রোদন করিতেই লাগিলেন ; ইহাই উল্লেখ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—“এইরূপ বলিতে বলিতে বিরহে অত্যন্ত বিবশহৃদয় ও স্বাভাবিক-প্রেমরস-ময় হৈ প্রসিদ্ধ গোপীগণ, প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্তচিত্তা হইয়া লজ্জা বিসর্জন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ‘হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব’ এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।’

গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভুর মুখে গোবিন্দ-শব্দের ধ্বনি বোধহয় এইরূপঃ—“তুমি গোকুলের ইন্দ্র ; তোমার অভাবে এই গোকুল ক্ষণ-কালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে ; অতএব হে গোবিন্দ ! তুমি মথুরায় যাইও না ।” অথবা গো ( গাভী )-সমূহকে পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ । “হে গোবিন্দ ! ব্রজের এই লক্ষ লক্ষ ধেনু তোমারই মুখ চাহিয়া জীবিত থাকে ; তোমাকে না দেখিলে তাহারা নিজেদের বৎস-সমূহকেও তৃপ্ত দান করে না, একগ্রাস তৃণ পর্য্যন্তও মুখে দেয় না ; তাহা তুমি জান ; তুমি চলিয়া গেলে তোমা-গত-প্রাণ ধেনু-কুলের কি অবস্থা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ । এই ধেনুদিগের কথা ভাবিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও—মথুরায় যাইও না ।” অথবা, গো ( ইন্দ্রিয় )-সমূহকে পালন ( তৃপ্তিদান ) করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ । “হে গোবিন্দ ! তুমি তোমার অসমোদ্ধ-মাধুর্য্যমণ্ডিত রূপ-লাবণ্য দেখাইয়া আমাদের নয়নকে, তোমার সুমধুর নন্দ-পরিহাসাদি শ্রবণ করাইয়া আমাদের কর্ণকে, গুণমদ-নীলোৎপল-বিনিন্দিত তোমার সুমধুর অঙ্গ-গন্ধ দ্বারা আমাদের নাসিকাকে, তোমার অধরামৃত দ্বারা আমাদের জিহ্বাকে, তোমার কোটীচন্দ্র-সুশীতল অঙ্গ-স্পর্শ দ্বারা আমাদের হৃদয়কে এবং তোমার সঙ্গ-সুখ দ্বারা আমাদের মনকে—এইরূপে তুমি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই তাহাদের বাঞ্ছিত বস্তু দ্বারা তৃপ্তিদান করিয়া পালন করিয়াছ ; তোমার বিরহে এই সকল ইন্দ্রিয় ( অর্থাৎ ) এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিকারীণী গোপীগণ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ? তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও ।” অথবা, ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ । “হে গোবিন্দ ! তুমি তো চলিলে, আমাদের মন-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও ; নচেৎ তাহারা ( তাহাদের অধিকারিণীগণ ) জীবিত থাকিবে না ।”

দামোদর-শব্দের তাৎপর্য্য । ব্রজেশ্বরী রজ্জু ( দাম ) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর-দেশে বন্ধন করিয়াছিলেন ( দামবন্ধন-লীলা ) । তজ্জন্ত শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম হইয়াছে “দামোদর” । এই দামোদর-শব্দ উচ্চারণ করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেশ্বরীর স্নেহের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন । “হে দামোদর ! যে ব্রজেশ্বরী তোমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার স্নেহের কথা একবার স্মরণ কর ; অথবা, তাহার স্নেহরজ্জুতে তুমি বদ্ধ হইয়াছিলে, তাহার কথা একবার স্মরণ কর । তোমার বিরহে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না ।”

মাধব-শব্দের-তাৎপর্য্য । মা-অর্থ লক্ষ্মী ; ধব-অর্থ পতি । মা-ধব—লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীও যাহাকে পতিহে বরণ করিয়াছেন । হে মাধব ! তোমার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে, তোমার বিলাস-বৈদগ্ধ্যীতে মুগ্ধা হইয়া নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও নাকি তোমাকে পতিরূপে পাইবার জন্ত উদ্বিগ্না হইয়াছিলেন ; এবং তিনিই নাকি একটি স্বর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষোদেশে বিরাজিত আছেন । বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াও, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও লক্ষ্মী যাহার বৈদগ্ধ্যাদি গুণের আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—সামান্য গ্রাম্য-গোয়ালিনী আমরা কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিব ? লক্ষ্মী দেবী, তাঁর শক্তি অতুলনীয় ; তিনিও তোমার বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করিতে



তবে স্বরূপ রামরায়,      করি নানা উপায়,  
 মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ।  
 গায়েন সঙ্গমগীত,      প্রভুর ফিরাইল চিত,  
 প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫১  
 এইমত বিলপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল ।  
 গন্তীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ॥ ৫২  
 প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে ।

স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গন্তীরার দ্বারে ॥ ৫৩  
 প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন ।  
 নামসঙ্কীৰ্ত্তন করে বসি করে জাগরণ ॥ ৫৪  
 বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিল ।  
 গন্তীরার ভিত্তে মুখ ঘষিতে লাগিল ॥ ৫৫  
 মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার ।  
 ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পারেন না ; তাই রেখারূপে নিরন্তর তোমার সঙ্গ করিতেছেন । আমরা মানবী হইয়া কিরূপে তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিব ? আমরা মানবী, আমাদের এমন কোনও শক্তি নাই, যদ্বারা রেখাদিরূপে নিজেদিগকে রূপান্তরিত করিয়া তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি । এই অবস্থায়, তোমার বিরহে আমাদের নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে ; আমাদের দূরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তুমি প্রতি-নিবৃত্ত হও । অথবা, মা-অর্থ না ; ধব—পতি । মাধব—পতি নহ ; হে মাধব ! তুমি আমাদের পতি বা স্বামী নহ ; যদি স্বামী হইতে, তাহা হইলে আমাদের উপর তোমার স্ব-স্বামিত্ব থাকিত, আমরা তখন তোমার নিজবস্ত হইতাম ; সুতরাং তখন তুমি আমাদের বধ করিলেও তোমার বিশেষ কিছু দোষ হইত না ; তোমার বস্ত, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতে । কিন্তু তুমি আমাদের পতি নহ—তুমি আমাদের সখা, তোমার সম্বন্ধে আমরা পরবস্ত, পরের বস্ত বিনষ্ট করায় তোমার কোনও অধিকার নাই—ইহা ভাবিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও ।

৫১। করে আশ্বাসন—প্রভুকে আশ্বস্ত করেন ।

সঙ্গম-গীত—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-বিষয়ক গীত । এইরূপ গীত গুণিতে গুণিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু ক্রমশঃ মনে করিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন । এইরূপ মনে হইলেই তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা দূরীভূত হইত, চিত্ত স্থির হইত ।

৫৩। প্রভুকে শয়ন করাইয়া রায়-রামানন্দ নিজগৃহে গেলে পরে স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ গন্তীরার দরজার সম্মুখে শয়ন করিয়া রহিলেন ।

৫৪। রাধা-প্রেমের আবেশে প্রভুর চিত্ত উদ্বেলিত ; তিনি গন্তীরার মধ্যে বসিয়া বসিয়া নামসঙ্কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং এই ভাবেই জাগরণ করিতে লাগিলেন, ঘুমাইলেন না ।

৫৫। বিরহে ব্যাকুল—শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভুর চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ( অস্থির ) । উদ্বেগ—মনের অস্থিরতা । ৩১৭১৪৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য । উদ্বেগভাবের উদয়ে প্রভু অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং উপবেশন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন । “প্রভুর উদ্বেগ উঠিল” স্থলে “প্রভু উদ্বেগে উঠিল” পাঠান্তরও আছে ।

ভিত্তি—প্রাচীর ; দেওয়াল । গন্তীরার ভিত্তে—গন্তীরানামক একোষ্ঠের ভিত্তিতে । “ভিত্তে” স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “ভিতরে” পাঠ আছে । কিন্তু দাস-গোস্বামীর শ্রীগৌরানুসঙ্গ-কল্পতরু গ্রন্থেও “ভিত্তি” পাঠ দেখা যায় । ঘষিতে লাগিল—ঘর্ষণ করিতে ( ঘষিতে ) আরম্ভ করিলেন । প্রভু উঠিয়া গন্তীরার প্রাচীরে বা দেওয়ালে নিজের মুখ ঘষিতে লাগিলেন । কেন প্রভু মুখ ঘষিতেছিলেন, তাহা পরবর্তী “দ্বার চাহি বুলি” ইত্যাদি বাক্যেই ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

৫৬। গণ্ডে—গালে । রক্তধার—রক্তের ধারা । ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণের ফলে প্রভুর মুখে, গালে ও নাকের অনেক স্থানে খুব বেশী রক্ত ক্ষত হইয়া গেল । ঐ সকল ক্ষতস্থান হইতে রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল ; কিন্তু ভাবাবেশে প্রভুর বাহুস্বত্ব ছিল না বলিয়া তিনি ঐ ক্ষত বা রক্তধারা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না ।

সর্ববরাত্রি করে ভাবে মুখ সজ্জ্বর্ণ ।

গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন ॥ ৫৭

দীপ জ্বালি ঘরে গেল, দেখি প্রভুর মুখ ।

স্বরূপ গোবিন্দ দৌহার হৈল মহা দুঃখ ॥ ৫৮

প্রভুকে শয্যাতে আনি স্থস্থির করিল ।

‘কাহা কৈলে এই তুমি ?’ স্বরূপ পুছিল ? ॥ ৫৯

প্রভু কহে—উদ্বিগ্নে ঘরে না পারি রহিতে ।

দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥ ৬০

দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে ।

ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥ ৬১

উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ।

যে করে যে বোলে সব উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৬২

স্বরূপ গোসাঞি তবে চিত্তা পাইল মনে ।

ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আরদিনে ॥ ৬৩

গৌর-রূপা তরঙ্গিণী টীকা ।

৫৭। এইরূপে সমস্ত রাত্রিই প্রভু ক্রমাগত মুখ-ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, শেষকালে উদ্বিগ্নে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেও লাগিলেন । কতক্ষণ পরে, প্রভুর গোঁ গোঁ শব্দ স্বরূপ-দামোদর শুনিতে পাইলেন ।

৫৮। দীপ জ্বালি—প্রদীপ জ্বালিয়া ।

গোঁ গোঁ-শব্দ শুনিয়া স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রদীপ হাতে গম্ভীরার মধ্যে গেলেন ; প্রদীপের আলোকে প্রভুর মুখে ক্ষত ও রক্তধারা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ।

৫৯। তখন তাঁহারা প্রভুকে ধরিয়া প্রভুর বিছানায় আনিয়া তাঁহাকে স্থস্থির করিলেন ; তারপর প্রভু স্থির হইলে, স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু, তুমি কি করিয়াছ ? কিরূপে তোমার মুখে ক্ষত হইল ?”

৬০-৬১। প্রভু কহে ইত্যাদি দুই পয়ার :- স্বরূপের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিলেন ( প্রভুর এখন কিঞ্চিৎ বাহুজ্ঞান হইয়াছিল )—“স্বরূপ ! শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, উদ্বিগ্নে আর ঘরে থাকিতে পারিতেছিলাম না । মনে করিয়াছিলাম, বাহিরে যাইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিব, তাড়াতাড়ি বাহির হইতে চেষ্টা করিলাম ; বাহির হওয়ার দ্বার ঠিক করিতে না পারিয়া চারিদিকে দ্বার অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে লাগিলাম ; কিন্তু দ্বার পাইলাম না, বাহিরেও যাইতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে চারিদিকের দেওয়ালের সঙ্গে মুখের ঘষা লাগিয়া মুখে ক্ষত হইয়াছে ও ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে ।”

কৃষ্ণ-বিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বোধহয় মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে অভিসার করিয়া আসিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষায় তিনি একাই নিকুঞ্জে বসিয়া আছেন ; কৃষ্ণ আসিতেছেন না বলিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে করিলেন, কুঞ্জের বাহিরে যাইয়া অন্বেষণ করিলেই কৃষ্ণকে পাইবেন ; তাই বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন । এতলে গম্ভীরাকে নিকুঞ্জমন্দির মনে করা এবং কৃষ্ণকে বৃন্দাবনস্থিত মনে করিয়া তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা ( প্রেম-বৈবশ্চ-চেষ্টিত )—উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ বলিয়াই মনে হয় ।

৬২। উন্মাদ-দশায়—রাধাভাবে দিব্যোন্মাদের অবস্থায় । উন্মাদ-দশায়-প্রভুর ইত্যাদি—প্রভু প্রায় সর্বদাই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় থাকেন বলিয়া তাঁহার মন কখনও স্থির থাকেনা ; তাঁহার বাহুস্বত্তি থাকে না বলিয়া দেহানুসন্ধানাদিও থাকে না । যে করে—প্রভু যাহা যাহা করেন । যে বোলে—প্রভু যাহা যাহা বলেন । সব উন্মাদ-লক্ষণ—প্রভু যাহা যাহা করেন এবং যাহা যাহা বলেন, তৎসমস্তই দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায় । যাহা করেন, তাহা প্রেম-বৈবশ্চজনিত উদ্ঘূর্ণা এবং যাহা বলেন, তাহা চিত্তজন্মাদি ।

৬৩। স্বরূপ-গোসাঞি ভাবিলেন—প্রভুর তো বাহুজ্ঞানই থাকেনা, তাই দেহস্বত্তিও থাকেনা । এক দিন তো গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘসিয়া নাকে মুখে ক্ষত করিয়া ফেলিলেন ; আবার কোন্ দিন কি করিয়া বসেন, তাহারই বা ঠিক কি ? এই সমস্ত ভাবিয়া, প্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থার আচরণে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কণ্ঠের আশঙ্কা করিয়া স্বরূপ

সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল ।  
শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৪  
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ।

প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ ॥ ৬৫  
'প্রভুপাদোপধান' বলি তার নাম হৈল ।  
পূর্বের বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী গীতা ।

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । এক দিন তিনি সকল ভক্তকে একত্র করিয়া, প্রভুর দেহের রক্ষার নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা নির্ধারণের নিমিত্ত পরামর্শ করিলেন ।

৬৪। পরামর্শ করিয়া সকলে স্থির করিলেন যে, প্রভুর সঙ্গে সর্দা একজন গ্রহরী থাকার দরকার ; তিনি যেন সর্দা প্রভুর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং প্রভুর দেহের কষ্ট হইতে পারে, এমন সব আচরণের যেন বাধা দেন । সকলে স্থির করিলেন—রাত্রিতে প্রভু যখন শয়ন করিবেন, তখন শঙ্কর-পণ্ডিতও প্রভুর সঙ্গে গভীরায় মধ্যে শয়ন করিবেন ; কিন্তু প্রভু এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কিনা, তাহাও সন্দেহ ; তাই সকলে মিলিয়া অনেক অনুন্নয়-বিনয় করিয়া প্রভুকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন । তদবধি শঙ্কর-পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে গভীরায় শয়ন করিতে লাগিলেন ।

শঙ্কর পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর গৌরব-বুদ্ধিহীন শুদ্ধা কেবলাপ্তি ; একথা প্রভু নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন ( ২।১৯।১২-৩৩ ) । এজ্যুই বোধহয় স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর সঙ্গে শুইবার জন্ত অত্যাচারেও নির্বাচিত না করিয়া শঙ্কর-পণ্ডিতকেই নির্বাচিত করিলেন ; তাঁহার মনে করিয়াছিলেন—ইহাকে সঙ্গে রাখিতে প্রভুর মনে কোনও রূপ সন্দেহ হইবে না । গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলেন—“যন্তা বক্ষসি স্তম্ভাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা । সা শ্রীভদ্রা গৌরান্ধপ্রিয়-শঙ্করপণ্ডিতঃ ॥ ১৫৭ ॥—ব্রজলীলায় যিনি শ্রীভদ্রা নামী সখী ছিলেন এবং তাঁহার বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মুখে নিদ্রা যাইতেন, তিনিই এক্ষণে শঙ্কর-পণ্ডিত ।” ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পূর্বলীলাতেও শঙ্কর-পণ্ডিত সম্বন্ধে প্রভুর কোনও সন্দেহ ছিলনা ; সুতরাং এই লীলাতেও সন্দেহ থাকার হেতু নাই । দুই লীলাতে পরিকরদের দেহভেদ থাকিলেও ভাবের ভেদ নাই, যেহেতু, তাঁহাদের ভাব নিত্যসিদ্ধ ।

**প্রভুরে সাধিল**—শঙ্কর-পণ্ডিতকে রাত্রিতে গভীরায় স্থান দেওয়ার নিমিত্ত অনুন্নয়-বিনয় করিয়া প্রভুকে সম্মত করাইলেন ।

৬৫। সেই দিন হইতে প্রভু যখন গভীরায় শয়ন করেন, তখন শঙ্কর-পণ্ডিতও প্রভুর চরণতলে আড়ভাবে শুইয়া থাকেন ; প্রভু তাঁহার দেহের উপরে চরণ রাখিয়া শুইতেন—যেমন বালিশের উপরে লোকে পা রাখিয়া ঘুমায় ।

৬৬। **পাদোপধান**—পাদ+উপধান ( বালিশ ) ; পা রাখিবার বালিশ ; পা-বালিশ । **প্রভু-পাদোপধান**—প্রভুর পা-বালিশ । যখন হইতে শঙ্কর-পণ্ডিত প্রভুর চরণতলে শয়ন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুও তাঁহার দেহের উপর চরণ রাখিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই শঙ্কর-পণ্ডিতকে সকলে প্রভুর পাদোপধান ( পা বালিশ ) বলিতেন । **তার নাম**—শঙ্কর-পণ্ডিতের নাম । **পূর্বের**—দ্বাপরলীলা-বর্ণন-সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে বিদুরকেও শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান ( পা-বালিশ ) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । তদ্রূপ এক্ষণেও প্রভুর পার্শ্ব ভক্তগণ শঙ্কর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর পাদোপধান বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ।

বিদুরকে যে কৃষ্ণের পাদোপধান বলা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পশ্চাত্ত্ব “ইতি ক্রবাণং” ইত্যাদি শ্লোক ।

“বিদুরে” স্থলে “উদ্ধবে” পাঠান্তরও আছে ; কিন্তু ইহা সম্ভবত বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, প্রমাণরূপে উদ্ধত শ্লোকে বিদুরের নামই দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ধবের নাম তাহাতে নাই ।

তথাহি ( ভাঃ ৩।১৩।৫ )—

ইতি ক্রবাণং বিদুরং বিনীতং

সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানম্ ।

প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়ং

প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৪ ॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসংবাহন ।

ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥ ৩৭

উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ।

প্রভু উঠি আপন কান্ধা তাহারে ওড়ায় ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

সহস্র-শীর্ষা শ্রীকৃষ্ণ স্তম্ভ চরণাবূপধীয়তে যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যন্তোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ । তমভ্যচষ্ট অভ্যভাষত প্রণীয়মানঃ তেন প্রবর্ত্যমানঃ । স্বামী । ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ৪। অন্বয়। ভগবৎ-কথায়ং ( ভগবৎ-কথায় ) প্রণীয়মানঃ ( প্রবর্ত্যমান ) প্রহৃষ্টরোমা ( পুলকিতগাত্র ) মুনিঃ ( মৈত্রেয়-মুনি ) ইতি ক্রবাণং ( এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন, সেই ) বিনীতং ( বিনীত ) সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানং ( শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধানস্বরূপ ) বিদুরং ( বিদুরকে ) অভ্যচষ্ট ( বলিলেন ) ।

অনুবাদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান-স্বরূপ বিদুর বিনীত ভাবে এই প্রশ্ন করিলে, ভগবৎ-কথায় প্রবর্ত্যমান মৈত্রেয়-মুনি পুলকিত-গাত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন । ৪

মহামুনি মৈত্রেয় যখন হরিদ্বারে ছিলেন, তখন মহাত্মা বিদুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে ভগবন্তদ্বাদিসম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন ; বিদুরের প্রশ্নে পরমপ্রীত হইয়া মৈত্রেয় মুনি ভগবৎ-কথা-কথনে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রসঙ্গক্রমে স্বায়ত্ত্ব মনুর কথা উঠিয়া পড়িল ; এই স্বায়ত্ত্ব-মনুসম্বন্ধেও বিদুর জিজ্ঞাসু হইলে মৈত্রেয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই স্মরণ করা হইয়াছে এই শ্লোকে ।

মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর **অভ্যচষ্ট**—বলিলেন ( মৈত্রেয় যাহা বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১৩।৫-আদি শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে ) । মৈত্রেয় কিরূপ ছিলেন তাহা বলিতেছেন—মৈত্রেয় ভগবৎ-কথায় **প্রণীয়মানঃ**—প্রবর্ত্যমান ছিলেন ; হরিদ্বারে যাইয়া বিদুর ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করাতেই মৈত্রেয় তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন ; সুতরাং বিদুরকর্তৃকই তিনি ভগবৎ-কথায় প্রবর্তিত হইয়াছিলেন ; তাই বলা হইয়াছে বিদুরকর্তৃক প্রণীয়মানঃ ( প্রবর্ত্যমান ) মৈত্রেয় ভগবৎ-কথা বলিতে বলিতেই সার্বিক ভাবের উদয়ে **প্রহৃষ্টরোমাঃ**—পুলকিত-গাত্র হইলেন, তাঁহার দেহে রোমাঞ্চের উদয় হইল ; এই অবস্থায় তিনি বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন । বিদুর কিরূপ ছিলেন ? **ইতি ক্রবাণং**—এই কথা—স্বায়ত্ত্ব মুনিসম্বন্ধে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু এবং **সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানম্**—শ্রীকৃষ্ণের চরণোপধান সদৃশ বিদুর । শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বিদুরের শঙ্কানিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি সহস্র-শীর্ষ-বিগ্রহ একটি করিয়াছিলেন । “সহস্রশীর্ষা বিদুরশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ তদগৃহে ধ্বতসহস্র-শীর্ষবিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণস্তম্ভ চরণয়োরূপধানমূপবর্হরূপং মহাতারতে বিদুরগৃহে ভোজনে ভগবাৎস্তুহৎসঙ্গে চরণৌ নিধায় সুশাপেতি প্রসিদ্ধেঃ । চক্রবর্তীটীকা ।” তাই এখানে বিদুরের প্রসঙ্গে সহস্রশীর্ষা বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে । বিদুর ছিলেন এই সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের উপধান ( বালিশ ) ; বিদুরের গৃহে ভোজনের পরে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ক্রোড়েই চরণদ্বয় রাখিয়া ঘুমাইয়াছিলেন ; তাই বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের চরণোপধান ( পা-বালিশ ) বলা হয় ।

৬৬ পরারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

৩৭। **ঘুমাঞা পড়েন**—প্রভু যখন ঘুমাইয়া পড়েন, তখন । **তৈছে**—এরূপে ; পা-বালিশরূপে । **করেন শয়ন**—শঙ্কর শয়ন করেন ।

৬৮। **উঘাড়-অঙ্গে**—অনাবৃত দেহে ; খালি গায়ে । **আপন কান্ধা**—প্রভুর নিজের গায়ের কাঁথা । **তাহারে ওড়ায়**—ওড়নির ( চাদরের ) মত তাহার ( শঙ্করের ) গায়ে দেন ।

নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন ।

বসি পাদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৬৯

তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে ।

তার ভয়ে নারে ভিত্তে মুখাজ ঘষিতে ॥ ৭০

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস ।

গৌরান্ধস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭১

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরান্ধস্তব-

কল্পতরো ( ৬ )—

স্বকীয়শ্চ প্রাণার্কদুসদৃশগোষ্ঠশ্চ বিরহাৎ

প্রলাপান্ধুর্কল্লবীঃ ভিত্তৌ প্রাচীরে শঙ্খনিরন্তরং বদনবিধুষর্ষণে মুখচন্দ্রঘর্ষণে ক্ষতোথং কুধিরং দধৎ

গৌরান্ধঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি উন্মত্তীকরোতি । শ্লোকমালা । ৫

ক্ষতোথং গৌরান্ধো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

স্বকীয়শ্চ নিজশ্চ প্রাণার্কদুসদৃশশ্চ প্রাণেন্দ্রিয়াদিতুল্যশ্চ গোষ্ঠশ্চ ব্রজশ্চ বিরহাৎ অদর্শনাৎ উন্মাদাৎ মহাভাবাত্মাদয়াৎ সততং প্রলাপান্ধুর্কল্লবীঃ ভিত্তৌ প্রাচীরে শঙ্খনিরন্তরং বদনবিধুষর্ষণে মুখচন্দ্রঘর্ষণে ক্ষতোথং কুধিরং দধৎ গৌরান্ধঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি উন্মত্তীকরোতি । শ্লোকমালা । ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

খালি গায়ে শঙ্কর ঘুমাইয়া থাকেন; তাহা দেখিয়া ভক্তবৎসল প্রভু উঠিয়া নিজের গায়ের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ে চাদরের মত করিয়া বিছাইয়া দিতেন—শঙ্করের শীতনিবারণের নিমিত্ত ।

“ওড়ায়” স্থানে “জড়ায়” পাঠান্তরও আছে ।

জড়ায়—গায়ে জড়াইয়া দেন ।

৬৯ । শীঘ্রচেতন—শীঘ্রই বাহ্যর চেতন হয়; শীঘ্রই যিনি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন । নিরন্তর ঘুমায় ইত্যাদি—নিরন্তর ( সর্বদাই ) এইরূপ হয় যে, শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়েন বটে, কিন্তু শীঘ্রই আবার ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন; তিনি কখনও সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটান না । বসি পাদ চাপি ইত্যাদি—ঘুম হইতে শীঘ্র জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া বসিয়া প্রভুর পাদ-সংবাহন করিয়া ( পা চাপিয়া ) রাত্রি জাগরণ করেন ( শঙ্কর ) । পাদ চাপি—মানি দূর করিবার নিমিত্ত এবং শীঘ্র ঘুম পাড়াইবার নিমিত্ত শঙ্কর আস্তে আস্তে প্রভুর পা চাপিতেন ।

৭০ । তার ভয়ে—শঙ্করপণ্ডিতের ভয়ে, পাছে শঙ্কর বাধা দেন বা কিছু বলেন । ভিত্তে—ভিত্তিতে । মুখাজ—প্রভুর মুখ-কমল; প্রভুর কমলের ছায় স্নেকোমল বদন ।

৭১ । রঘুনাথদাস-গোস্বামী স্বরচিত শ্রীগৌরান্ধস্তব-কল্পতরুগ্রন্থে প্রভুর মুখ-সংঘর্ষণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন; তদবলম্বনেই কবিরাজগোস্বামী এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন । দাস-গোস্বামীর রচিত শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৫। অম্বয়। স্বকীয়শ্চ ( স্বীয় ) প্রাণার্কদুসদৃশগোষ্ঠশ্চ ( প্রাণার্কদুসদৃশগোষ্ঠের ) বিরহাৎ ( বিরহে ) উন্মাদাৎ ( উন্মত্ত হইয়া ) সততং ( সর্বদা ) প্রলাপান্ধুর্কল্লবীঃ ( যিনি অতিশয় প্রলাপ করিতেন ) বিকলধীঃ ( এবং বিকলবুদ্ধিবশতঃ ) ভিত্তৌ ( ভিত্তিতে ) বদনবিধুষর্ষণে ( মুখচন্দ্রের ঘর্ষণহেতু ) ক্ষতোথং কুধিরং ( ক্ষত হইতে নির্গত কুধির ) শঙ্খং ( নিরন্তর ) দধৎ ( যিনি ধারণ করিতেন, সেই ) গৌরান্ধঃ ( শ্রীগৌরান্ধদেব ) হৃদয়ে ( হৃদয়ে ) উদয়ন্ ( উদিত হইয়া ) মাং ( আমাকে ) মদয়তি ( উন্মত্ত বা ব্যাকুল করিতেছেন ) ।

অনুবাদ । যিনি স্বকীয় প্রাণার্কদুসদৃশ গোষ্ঠের ( বৃন্দাবনের ) বিরহে উন্মত্ত হইয়া সর্বদা অতিশয় প্রলাপ করিতেন, এবং উন্মাদ-জনিত বিকল-বুদ্ধিবশতঃ ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ-হেতু যাহার মুখক্ষত হইতে নিরন্তর কুধিরধারা নির্গত হইত, সেই শ্রীগৌরান্ধদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছেন । ৫

প্রাণার্কদুসদৃশগোষ্ঠশ্চ—প্রাণার্কদেব ( কোটি কোটি প্রাণের ) সদৃশ প্রিয় যে গোষ্ঠ ( বৃন্দাবন ), তাহার । লোকের নিকটে নিজের প্রাণ যতটুকু প্রিয়, তাহা অপেক্ষা কোটি কোটিগুণে প্রিয় ছিল গোষ্ঠ বা বৃন্দাবন—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।  
 প্রেমসিদ্ধিমগ্ন রহে, কভু ডুবে ভাসে ॥ ৭২  
 এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসীদিনে ।  
 রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উঠানে ॥ ৭৩  
 জগন্নাথবল্লভনাম উঠান-প্রধানে ।  
 প্রবেশ করিল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৪  
 প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী—যেন বৃন্দাবন ।

শুক সারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৭৫  
 পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন ।  
 গুরু হঞা তরুলতা শিখায় নর্তন ॥ ৭৬  
 পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ।  
 তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৭৭  
 ছয়ঋতুগণ যাহাঁ বসন্তপ্রধান ।  
 দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্ ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রভুর নিকটে ; সেই বৃন্দাবনের বিরহে—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদাৎ—বিরহজনিত দিব্যোন্মাদবশতঃ প্রভু সর্বদাই নানাবিধরূপে প্রলাপ করিতেন ; এবং ঐ দিব্যোন্মাদবশতঃ তাহার বুদ্ধিও যেন বিকলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তাই তিনি গভীরার ভিত্তে—ভিত্তিতে, প্রাচীরে, দেওয়ালে স্বীয় মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করিতেন ( ৩১৯৫৫ পয়ার ) ; তাহার কলে মুখে ক্ষত হইত ; এই ক্ষত হইতে সর্বদা রক্তস্রাব হইত ( ৩১৯৫৬ পয়ার ) ।

৫৫-৫৭ পয়ারোক্ত লীলার প্রমাণ এই শ্লোক ।

৭২ । কভু ডুবে—প্রভু কখনও কখনও প্রেমসিদ্ধিতে ডুবিয়া যান ; রাধাপ্রেমাবেশে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন ।

ভাসে—কভু ভাসেন ( প্রভু ) ; প্রভু কখনও কখনও বা প্রেমসিদ্ধিতে ভাসিয়া উঠেন ; অর্দ্ধবাহু দশা প্রাপ্ত হইতেন । কিন্তু সকল সময়েই প্রেমসিদ্ধির মধ্যে থাকেন—সকল সময়েই রাধাপ্রেমের আবেশ থাকে ।

৭৩ । এক কালে—এক সময়ে । পৌর্ণমাসীদিনে—পূর্ণিমায় ।

৭৪-৭৫ । চারি পয়ারে জগন্নাথবল্লভ-নামক উঠানের বর্ণনা দিতেছেন ।

প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—উঠানের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতাই প্রফুল্লিত পুষ্পসমূহে মণ্ডিত হইয়া আছে । যেন বৃন্দাবন—দেখিলে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয় । বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতাই সর্বদা পুষ্পিত থাকে । পিক—কোকিল । ভৃঙ্গ—ভ্রমর ।

উঠানে শুক, সারী, কোকিলাদি পক্ষিগণ মধুরকণ্ঠে শব্দ করিতেছে, আর ভ্রমরও মধুর গুঞ্জন করিতেছে ।

৭৬ । পুষ্পগন্ধ লঞা ইত্যাদি—প্রফুল্লিত পুষ্পসমূহ হইতে সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া মলয়-পবন প্রবাহিত হইতেছে । মলয়-পবন—দক্ষিণ দিকস্থিত মলয়-নামক চন্দন-বৃক্ষ-বহুল পর্বত হইতে আগত বায়ু ; ইহা সুখস্পর্শ । গুরু হঞা—মলয়-পবন—গুরু হইয়া ( যেন গুরু রূপে ) । তরুলতা—তরু ( বৃক্ষ ) ও লতাকে । শিখায়—শিক্ষা দেয় ( মলয় পবন ) । নর্তন—নৃত্য । গুরু হঞা ইত্যাদি—উঠানে মলয়-পবন প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে উঠানস্থ সমস্ত বৃক্ষ-লতাই একটু একটু ছলিতেছে ; মনে হইতেছে যেন, বৃক্ষ-লতা নৃত্য অভ্যাস করিতেছে—মলয়-পবনই যেন নৃত্য-শিক্ষার গুরু হইয়া তাহাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেছে ।

৭৭ । পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায়—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় । পরম উজ্জ্বল—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সমস্ত উঠান অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছে । তরুলতা জ্যোৎস্নায় ইত্যাদি—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উঠানের সমস্ত বৃক্ষলতা ঝলমল করিতেছে ।

৭৮ । ছয়ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই ছয় ঋতু । যাহাঁ—যে স্থানে, যে উঠানে । বসন্ত-প্রধান—বসন্তই প্রধান ঋতুদের ( যে ছয় ঋতুর ) ।

এই পয়ারের অর্থঃ—যাহাঁ ( যে উঠানে ) বসন্ত-প্রধান ছয় ঋতুকে দেখিয়া গৌর ভগবান্ আনন্দিত হইলেন ।



‘ললিত-লবঙ্গলতা’ পদ গাওয়াইয়া ।  
 নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজ-গণ লৈয়া ॥ ৭৯  
 প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।  
 অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥ ৮০  
 কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু খাইয়া চলিলা ।

আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দান হৈলা ॥ ৮১  
 আগে পাইলা কৃষ্ণ, তারে পুন হারাইয়া ।  
 ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্ছিত হইয়া ॥ ৮২  
 কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান ।  
 সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

ভগবান্ গৌরসুন্দরের অলৌকিক প্রভাবে, সেই রাত্রিতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে ছয় ঋতুই যুগপৎ বিরাজিত ছিল ; কিন্তু ছয় ঋতু বিরাজিত থাকিলেও বসন্ত-ঋতুই সকলের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল ; ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে নীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুতেও বসন্তের প্রভাবই লক্ষিত হইয়াছিল ।

এই পয়ারে গৌরের বিশেষণরূপে “ভগবান্” শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ একই স্থানে একই সময়ে ছয়ঋতুর অবস্থান সম্ভব নয় ; আবার এক ঋতুর মধ্যে অষ্ট ঋতুর প্রভাব লক্ষিত হওয়াও সম্ভব নয় । শ্রীগৌর-সুন্দরের ভগবত্তার প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে ; ছয়ঋতুই যেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবার নিমিত্ত যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে ।

৭৯। ললিত-লবঙ্গ-লতা-পদ—ইহা শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থের প্রথম সর্গের একটা গীতের প্রথম পদ । পদটী বসন্তরাস-সম্বন্ধে ; এতলে উক্ত গীতটির ধূয়া উদ্ধৃত হইল :—“ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুঞ্জিত-কুঞ্জ-কুটীরে । বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে নৃত্যতি যুবতি-জনে সমং সখি বিরহিজনস্ত হুরন্তে ॥—যে স্থানে ললিত-লবঙ্গ-লতার আলিঙ্গন-লব্ধ কোমলত্ব লইয়া মলয়-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে মধুকর-সমূহ মধুর গুঞ্জন করিতেছে এবং কোকিলসমূহ কুঞ্জন করিতেছে, সেই কুঞ্জকুটীরে—বিরহিজনের দুঃখপ্রদ-সরসবসন্ত-সময়ে—শ্রীহরি যুবতি-জনের সহিত নৃত্য বিহার করিতেছেন ।”

গাওয়াইয়া—গান করাইয়া ( স্বরূপ-দামোদরাদি-দ্বারা ) ; প্রভুর আদেশে স্বরূপ-দামোদরাদি ললিত-লবঙ্গ-লতা-পদ কীর্ত্তন করিলেন । আর প্রভু তাহা শুনিতে শুনিতে স্বীয় পার্শ্বদ-ভক্তগণের সঙ্গে উদ্যান-মধ্যে নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । স্বাধাভাবাবিষ্ট প্রভু “ললিত-লবঙ্গ-লতা” পদ শুনিয়া বসন্ত-রাসের ভাবেই বোধহয় আবিষ্ট হইয়াছিলেন ; সেই ভাবে নিজেকে শ্রীরাধা এবং সঙ্গীয় ভক্তগণকে সখীমণ্ডলী মনে করিয়া আর জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানকে বৃন্দাবন মনে করিয়াই বোধহয় নৃত্য করিতেছিলেন । ইহা উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ ।

৮০। প্রতিবৃক্ষবল্লী—প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক লতা । ঐছে—এক্রূপে, নিজগণ লইয়া । অশোকের তলে—অশোক গাছের নীচে । প্রভু নিজগণকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যেক গাছের এবং প্রত্যেক লতার নীচে নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছিলেন ; এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, একটি অশোক গাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন ।

৮১। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মহাপ্রভু দৌড়িয়া দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সন্মুখের দিকে চাহিয়াই প্রভুকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আর কৃষ্ণকে দেখা গেল না ।

আগে দেখি—সন্মুখের দিকে চাহিয়া । অন্তর্দান হৈলা—অন্তর্হিত হইলেন, আর তাঁহাকে দেখা গেল না ।

৮২। কৃষ্ণকে সাক্ষাতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু পাইয়াও পুনরায় তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণায় প্রভু মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ।

৮৩। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেও তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে সমস্ত উদ্যান ভরপুর হইয়াছিল ; ঐ গন্ধ প্রভুর নাসিকায় প্রবেশ করিতেই প্রভু হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ।

নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল ।

গন্ধ আশ্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৪

কৃষ্ণগন্ধলুক রাধা সখীকে যে কহিলা ।

সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা ॥ ৮৫

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ( ৮৬ )—

কুরঙ্গমদজিহ্বপুঃপরিমলোন্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ

স্বকাসনলিনাষ্টকে শশিযুতাজ্জগন্ধপ্রথঃ ।

মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চাচ্চিতঃ

স যে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

স কৃষ্ণো মম নাসাস্পৃহাং তনোতি স্বসৌরভেনেতি শেষঃ । কুরঙ্গমদো মৃগমদস্তজিহ্বপুঃ পরিমলোন্মিকৃষ্টিঃ আকৃষ্টাঃ অঙ্গনা উত্তমা নার্যো যেন সঃ । স্বকীয়াক্রূপ-নলিনাষ্টকে পাদদ্বয়-করদ্বয়-নেত্রদ্বয়-নাভিগুথরূপাষ্টকমলেষু শশিঃ কর্পূরঃ তদযুতাজ্জগন্ধ গন্ধঃ প্রথয়তি বিস্তারয়তি যঃ সঃ । মদঃ কন্তুরীচ ইন্দুঃ কর্পূরশ্চ বরচন্দনঞ্চ অগুরুঃ কৃষ্ণা গুরুশ্চ এতৈঃ কৃতাতিঃ সুগন্ধি-বিশিষ্ট-চর্চাভিরঙ্গলেপকৈরর্চিতো লিপ্তঃ । সদানন্দবিধায়িনী । ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৮৪ । ক্ষণপরেই বোধ হয় প্রভুর মুখা ভঙ্গ হইল, তখনও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ ; প্রভুর নাসিকায় নিরন্তরই সেই অপূর্ণগন্ধ প্রবেশ করিতেছে ; সেই চিত্তোন্মাদক-গন্ধ আশ্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকর্ষায় রাধা ভাবাবিষ্ট প্রভু উন্মত্তের ছায় হইয়া পড়িলেন ।

পৈশে—প্রবেশ করে । কৃষ্ণ-পরিমল—কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ । পাগল—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সাক্ষাদভাবে তাঁহার অঙ্গগন্ধ আশ্বাদনের লোভে উন্মত্তের মত হইলেন ।

৮৫ । কৃষ্ণ-গন্ধ-লুক—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আশ্বাদনের নিমিত্ত লালসায়িতা । সেই শ্লোক—যে শ্লোকে শ্রীরাধা নিজ সখীর নিকটে নিজের কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ-লুকতার কথা বলিয়াছেন ; নিম্নোক্ত “কুরঙ্গ-মদজিহ্বপুঃ” ইত্যাদি শ্লোক ।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আশ্বাদনের নিমিত্ত লালসায়িতা হইয়া শ্রীরাধা যে শ্লোকে নিজ সখীর নিকট নিজের মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধলুক হইয়া সেই শ্লোকই উচ্চারণ করিলেন এবং পরে প্রলাপে তাহার অর্থ করিলেন ।

শ্লো। ৬। অময় । অময় সহজ ।

অনুবাদ । শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি ! মৃগমদবিজয়ী শ্রীঅঙ্গের পরিমলোন্মিকৃষ্টাঙ্গারা যিনি ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি আপনার অঙ্গরূপ অষ্টপদে ( নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও মুখ ) কর্পূরযুক্ত পদ্যের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন, এবং যিনি মৃগমদ, কর্পূর, বরচন্দন এবং কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা স্বীয় অঙ্গ চর্চিত করেন, সেই মদন-মোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন । ৬

কুরঙ্গমদজিহ্বপুঃপরিমলোন্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ—কুরঙ্গমদকে ( মৃগমদকে, কন্তুরীকে ) জয় করে, সুগন্ধে পরাভূত করে, এমন যে বপুঃপরিমল ( বপুর বা দেহের পরিমল বা সুগন্ধ ), তাহার উন্মি ( তরঙ্গ ) দ্বারা আকৃষ্ট হয় অঙ্গনাগণ যৎকর্তৃক ; যাহার অঙ্গগন্ধের তুলনায় কন্তুরীর সুগন্ধও নগণ্য, সেই কৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গগন্ধের তরঙ্গদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীয় সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনেন ; তাঁহার অঙ্গগন্ধে প্রলুক হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন । উন্মি শব্দের তাৎপর্য এই যে, জলের তরঙ্গ যেমন একটার পর আর একটা আসিয়া তীরকে বা জলমধ্যস্থ কোনও লোককে অনবরত আঘাত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও বায়ুর তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া প্রতিক্ষণেই নাসিকাকে স্পর্শ করে—বায়ুর তরঙ্গ তো নয়, যেন অঙ্গগন্ধই তরঙ্গাকারে প্রতিক্ষণে ভাসিয়া আসিতেছে ।

যথারাগঃ—

কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,  
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ।

ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব-আকর্ষণে,  
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৮৬

গৌর-কৃষ্ণ-ভরঙ্গী টীকা ।

অকাজনলিনাঠকে--স্বক ( স্বকীয় ) অঙ্গরূপ ( পদদ্বয়, করদ্বয়, নয়নদ্বয়, নাভি ও মুখ - এই আটটি অঙ্গরূপ ) নলিনাঠকে আটটি পদে শশিমুতাজগন্ধপ্রাণঃ—শশি ( কর্পূর ) যুক্ত অঙ্গের ( পদের ) গন্ধ প্রথিত বা বিস্তারিত করেন যিনি । শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ, দুই হস্ত, দুই নয়ন, নাভি ও মুখ—এই আটটি অঙ্গকে আটটি পদ বলা হইয়াছে—পদের তায় সুন্দর, স্নিগ্ধ, কোমল এবং সুগন্ধি বলিয়া ; পদের গন্ধের সহিত কর্পূরের গন্ধ মিশ্রিত হইলে যে একটি স্নিগ্ধ মধুর গন্ধের উদ্ভব হয়, শ্রীকৃষ্ণের উক্ত আটটি অঙ্গ হইতেও সর্বদা তদ্রূপ মনোরম গন্ধ প্রসারিত হইতে থাকে ।

মদেন্দুবরচন্দ্রনাথসুগন্ধিচর্চাচ্চিত্তঃ—মদ ( মৃগমদ বা কস্তুরী ), ইন্দু ( কর্পূর ), বরচন্দ্রন ( উৎকৃষ্ট চন্দ্রন ) ও অগুরু ( কৃষ্ণাগুরু ) এ সমস্ত দ্বারা সুগন্ধি ( সুগন্ধবিশিষ্ট ) যে চর্চা ( অঙ্গলেপ ), তদ্বারা যিনি ( বাঁহার অঙ্গ ) চর্চিত ( অলুপ্ত ) হয় ; সেই মদনমোহন । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ একটি অতিসুগন্ধি অঙ্গলেপ দ্বারা লিপ্ত ; কস্তুরী, কর্পূর, চন্দ্রন ও কৃষ্ণাগুরু দ্বারা সেই অঙ্গলেপকে সুগন্ধি করা হইয়াছে ।

পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে ।

৮-৬ । ত্রিপদী-সমূহে “কুরঙ্গ-মদ-জিবুঃ” ইত্যাদি শ্লোকের মহাপ্রভু-কৃত অর্থ ব্যক্ত হইতেছে ।

প্রথমে “কুরঙ্গ-মদ-জিবুঃপরিমলোন্মিষ্টাঙ্গনঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন “কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল” ইত্যাদি ত্রিপদী সমূহে ।

কস্তুরী—মৃগনাভি । নীলোৎপল—নীলপদ্ম । কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল—কস্তুরী দ্বারা আবৃত নীলপদ্ম । কস্তুরী ও নীলপদ্ম, ইহাদের প্রত্যেকের সুগন্ধই অত্যন্ত মনোরম ; উভয়ের মিশ্রণে যে অপূর্ণ সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, তাহা অনির্কচনীয় । “কস্তুরীলিপ্ত” হলে “কস্তুরিকা” পাঠান্তরও আছে । তার—কস্তুরী-লিপ্ত নীলোৎপলের । পরিমল—গন্ধ । তাহা জিনি—কস্তুরী-লিপ্ত নীলোৎপলের গন্ধকেও পরাজিত করিয়া । ব্যাপে—ব্যাপ্ত হয় ( কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ ) । আঁখি—চক্ষু । নারীগণের আঁখি করে অন্ধ—কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীগণের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয়, তাহাদের চক্ষুর শক্তি যেন নষ্ট করিয়া দেয় । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ এতই মনোহর যে, সেই গন্ধ যখন নারীগণের নাসায় প্রবেশ করে, তখন ঐ গন্ধ আশ্বাদনের নিমিত্তই তাহাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়—নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যনির্বাহার্থ মনোবৃত্তির যে অংশ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাও যেন আসিয়া নাসিকার বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া যায় । এই অবস্থায় নারীগণ তন্ময়ভাবে নিমীলিত-নয়নে কেবল গন্ধই অনুভব করিতে থাকেন । গন্ধ-আশ্বাদনের নিমিত্ত চক্ষু নিমীলিত ( অন্ধের তায় ) হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ নারীগণের চক্ষুকে অন্ধ করে ।

রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু পার্শ্ববর্তী রায়-রামানন্দাদিকে সখী মনে করিয়া বলিলেন—“সখি ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের মনোহারিত্বের কথা আর কি বলিব ! কিসের সঙ্গেই বা তাহার তুলনা দিয়া বুঝাইব ! কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের তুলনা কৃষ্ণাঙ্গগন্ধই—ইহার আর অণু তুলনা জগতে নাই । সখি ! আমাদের পরিচিত অণু যত সুগন্ধি বস্তু আছে, তাদের মধ্যে কস্তুরী এবং নীলোৎপলই সুগন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের নিকটে ইহারা অতি তুচ্ছ ! ইহাদের প্রত্যেকের কথা তো দূরে, নীলোৎপলের উপরে সর্বতোভাবে কস্তুরী লেপিয়া দিলে—কস্তুরী ও নীলোৎপলের মিলিত সুগন্ধে—যে একটি পরম মধুর অপূর্ণ সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও পরাজিত ! শ্রীকৃষ্ণের এই অনির্কচনীয় অঙ্গগন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উৎখিত হইয়া যেন চতুর্দশ-ভুবনকে ভরপুর করিয়া থাকে, আর সকলের

সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায় ।  
নারীর নাসায় পৈশে, সর্বকাল তাহা বৈসে,  
কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায় ॥ প্র ॥ ৮৭

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,  
এই অষ্ট পদ্য কৃষ্ণ-অঙ্গে ।

কপূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,  
সেই গন্ধ অষ্টপদ্য-সঙ্গে ॥ ৮৮  
হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,  
তাহে অগুরু কুকুম কস্তুরী ।  
কপূরসনে চর্চা অঙ্গে, পূর্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,  
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতে থাকে। সখি ! এই গন্ধ নারীগণের উপর একটি অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীগণের নাসিকায় প্রবেশ করিলে, তাহার মনোহারিত্বে তাঁহারা এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে, তাঁহারা অঙ্গের ছায়া নয়ন নিম্নলিখিত করিয়া যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকেই নাসিকায় কেন্দ্রীভূত করিয়া তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ আনন্দন করিতে থাকেন ।”

৮৭। সখি হে—রাধাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু পার্শ্ববর্তী রায়-রামানন্দাদিকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ।

মাতায়—মত্ত করে। পৈশে—প্রবেশ করিয়া। সর্বকাল তাহা বৈসে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সর্বদাই নারীর নাসায় বসিয়া থাকে ; যে নারী একবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন, সর্বদাই যেন তাঁহার মনে হয় যে, ঐ পরম-রমণীয় গন্ধ সর্বদাই তিনি অনুভব করিতেছেন। কৃষ্ণ-পাশে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীর নাসায় প্রবেশ করিয়া, যেন নাকে দড়ি দিয়াই, সেই নারীকে কৃষ্ণের নিকটে ধরিয়া লইয়া যায় ; অর্থাৎ যে নারী একবার কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন, তিনি আর কৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া না বাইয়া থাকিতে পারেন না ।

“সখি ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তাহার মনোহারিতায় জগৎকে যেন মত্ত করিয়া ফেলে। ইহা নারীর নাসিকায় প্রবেশ করিয়া যেন নাসিকার মধ্যেই বাসা করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকে ; আর যেন নাকে দড়ি দিয়া নারীকে কৃষ্ণের নিকটে টানিয়া লইয়া যায় ।”

৮৮। এক্ষণে শ্লোকস্থ “স্বকান্দনলিনাষ্টকে শশিযুতাজগন্ধপ্রথঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন, “নেত্র নাভি” ইত্যাদি ত্রিপদীতে ।

নেত্র—চক্ষু। করযুগ—দুইটী হাত ।

অষ্টপদ্য—আটটি পদ্য ; শ্রীকৃষ্ণের দুইটী চক্ষু দুইটী পদ্য, নাভি একটি পদ্য, বদন (মুখ) একটি পদ্য, দুইটী হাত দুইটী পদ্য এবং দুই চরণ দুই পদ্য ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মোট এই আটটি পদ্য। পদ্যের ছায়া সুন্দর, স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধি বলিয়া এই আটটি অঙ্গকে পদ্যের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে ।

কপূরলিপ্ত—কপূর-চূর্ণদ্বারা মণ্ডিত। কমল—পদ্য। পরিমল—সুগন্ধ। অষ্টপদ্য-সঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের নেত্রাদি আটটি অঙ্গরূপ পদ্যে ।

কমলকে কপূর দ্বারা লেপন করিলে ঐ পদ্যের যেরূপ সুগন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের নেত্রাদি আটটি অঙ্গেও সেইরূপ অপূর্ব সুগন্ধ আছে ।

৮৯। এক্ষণে শ্লোকস্থ “মদেন্দুবরচন্দনাগুরু-সুগন্ধিচর্চাচ্চিতঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন—“হেমকীলিত চন্দন” ইত্যাদি ত্রিপদীতে ।

হেম—স্বর্ণ। কীলিত—প্রোথিত, বদ্ধ ।

হেমকীলিত চন্দন—সোনার হাতল-যুক্ত চন্দন। চন্দন অত্যন্ত শীতল ; ঘষিবার সময় হাতে ধরিলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে ; তাতে ঘষিবার পক্ষে একটু অসুবিধা হয়। তাই চন্দনের যে স্থান ধরিয়া চন্দন ঘষা হয়, সেই

হরে নারীর তনুমন,                      নাসা করে ঘূর্ণন,      করি আগে বাউরী,                      নাচায় জগত-নারী,  
খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ ॥                      হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা।

স্থান যদি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হয়, তবে ঘষিবার সময় চন্দনে হাত লাগে না, সোনাতেই হাত লাগে। এইরূপ সোনার হাতলযুক্ত চন্দনকে হেমকীলিত চন্দন বলে।

“হেমকীলিত চন্দন”-স্থলে “হিমকলিত চন্দন” পাঠও দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ হইবে—হিমের (কর্পূরের) সহিত কলিত (মিশ্রিত) চন্দন; কর্পূর-মিশ্রিত চন্দন। কিন্তু এই পাঠান্তর গ্রহণ করিলে একটা সমস্যা জাগে এই ত্রিপদীরই শেষার্ধ্বে লিখিত “কর্পূরসনে চর্চা” বাক্য লইয়া। এই পাঠান্তর অঙ্গসারে সমগ্র ত্রিপদীটির অর্থ হইবে এই :—কর্পূর মিশ্রিত চন্দন ঘষণ করিয়া তাহাতে অগুরু, কুসুম, কস্তুরী ও কর্পূরের সঙ্গে রচিত যে অঙ্গ-চর্চা (অঙ্গ-লেপন), তাহা পূর্ব অঙ্গগন্ধের সঙ্গে মিলিয়া ইত্যাদি। “কর্পূর মিশ্রিত” চন্দনের সঙ্গে আবার “কর্পূর মিশ্রিত” করার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। দ্বিকল্পি বলিয়া ইহা সমীচীন মনে হয় না।

তাহে—ঘৃষ্ট চন্দনে। কর্পূরসনে—কর্পূরের সঙ্গে। চর্চা—লেপন (কর্পূরমিশ্রিত ঘৃষ্ট চন্দনের)। অঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে (কর্পূরমিশ্রিত চন্দন-চর্চা)। পূর্ব অঙ্গের গন্ধ—চন্দনচর্চার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের যে স্বাভাবিক গন্ধ ছিল, তাহা। ডাকা—ডাকাইত। কৈল চুরি—মনকে চুরি করিল।

সুশীতল এবং সুগন্ধি চন্দনের সঙ্গে অগুরু, কুসুম, কস্তুরী ও কর্পূরাদি পরমসুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লেপন করা হয়; ইহাদের প্রত্যেকটি বস্তুই মনোরম গন্ধযুক্ত; ইহাদের মিলনে যে একটা অপূর্ব সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, তাহা একমাত্র অমৃতবের বস্তু, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। আবার শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক অঙ্গগন্ধের সহিত ইহার মিলনে যে একটা অনির্বচনীয় সুগন্ধের উদ্ভব হয়, তাহা যে কি বস্তু, তাহা কিরূপে জানাইব? তবে তাহার একটা অসাধারণ শক্তির কথা বলিতে পারি; ডাকাইত যেমন দ্বার ভাঙ্গিয়া লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সাক্ষাতেই গৃহের সমস্ত দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়, গৃহস্থ কিছুতেই তাহাতে বাধা দিতে পারেনা; তদ্রূপ চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুসুমের গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও কুলবতী রমণীদিগের নাসিকার ভিতর দিয়া—গৃহস্থের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া—তাহাদের চিত্তকুঠরীতে প্রবেশ করে এবং সেইস্থান হইতে, তাহাদের চক্ষুর সাক্ষাতেই। তাহাদের লজ্জা, ধর্ম, কুল, শীল, সংযম—এক কথায় তাহাদের যথাসর্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহারা কোনরূপেই তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হন না।

“মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি” স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে “কামদেবের মন কৈল চুরি” এইরূপ পাঠও আছে। ইহার অর্থ—যে কামদেব জগতের সকলের মনকেই চুরি করে, যে কামদেবের মনকে অপর কেহ চুরি করিতে সমর্থ নহে, চন্দনাগুরুকুসুম-কস্তুরী-কর্পূর-চর্চিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সেই কামদেবের মনকেও চুরি করে, এতই তার প্রভাব।

আবার, “মিলি ডাক দিয়া করে চুরি” এবং “মেলি তাকে যেন কৈল চুরি” এরূপ পাঠান্তরও আছে; অর্থ সহজবোধ্য।

৯০। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ যে রমণীকুলের লজ্জা-ধর্মাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহার নিদর্শন দেখাইতেছেন—“হরে নারীর” ইত্যাদি ত্রিপদীতে।

হরে নারীর তনুমন—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ রমণী-কুলের দেহ এবং মন হরণ করে। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ একবার যে রমণীর নাসিকায় প্রবেশ করে, সেই রমণী মনপ্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে বাধ্য হন, নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন।

সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, পাইলে পিয়া পেট ভরে, 'পিণ্ডো পিণ্ডো' তভু করে,  
কভু পায় কভু নাহি পায় । না পাইলে তৃষায় মরি যায় ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

নাসা করে ঘূর্ণন—নাসিকাকে বিঘূর্ণিত করিয়া দেয় (অঙ্গগন্ধ); নাসিকাকে অল্প সকল গন্ধের দিক্ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া কেবল নিজের (কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের) দিকেই ফিরাইয়া রাখে। ভাবার্থ এই যে, যে রমণী একবার কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের আশ্বাদ পান, তাঁহার নাসিকায় আর অল্প গন্ধ প্রবেশ করিতে পারেনা, তিনি সর্বদাই নিজের মাসায় কেবল শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধই অনুভব করিয়া থাকেন।

খসায় নীবী—কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ রমণীদিগের নীবী (কটিবন্ধ) খসাইয়া দেয়; কন্দর্পোদ্বেকে তাঁহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। ছুটায় কেশবন্ধ—কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ রমণীদিগের কেশের (চুলের) বন্ধন ছুটাইয়া দেয়; ইহাও কন্দর্পোদ্বেকের লক্ষণ। বাউরী—পাগলিনী; হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ও অল্প বিষয়ে অনুসন্ধানশূন্য। হেন ডাকাতি—এইরূপ ডাকাইতের ভাবাপন্ন। “হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ” স্থানে “হেন কৃষ্ণের ডাকাতিয়া গন্ধ” পাঠও আছে।

“কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের আচরণ দুর্দাস্ত ডাকাইতের আচরণের তুল্য—তুল্য বলি কেন, ডাকাইতের আচরণ অপেক্ষাও ভীষণতর। ডাকাইত কেবল গৃহের দ্রব্যসামগ্রীই লইয়া যায়, গৃহ নেয়না; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধরূপ অদ্ভুত ডাকাইত, রমণীকুলের লজ্জাধর্মাদি সম্পত্তিও চুরি করে এবং লজ্জাধর্মাদির আশ্রয়ভূত (গৃহস্বরূপ) দেহটিকেও হরণ করিয়া নিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অর্পণ করে। লজ্জা এবং আর্য্যপথ—এই দুইটাই হইল রমণীর প্রধান সম্পত্তি; কুলবতী রমণীগণ এই দুইটি সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। এই দুইটাই যদি রমণী হারান, তাহা হইলে তাঁহার আর কি থাকে সখি? ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের হস্তে রমণীদের এই অবস্থাই ঘটয়াছে—তাঁহারা সর্বস্বহারা হইয়াছেন। ডাকাইত যেমন গৃহের জিনিসপত্র উলটপালট করিয়া রাখিয়া যায়, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও রমণীদের নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের নাসিকাকে অল্প সকল দিক্ হইতে ঘুরাইয়া কেবল নিজের দিকেই ফিরাইয়া রাখে—অল্প কোনও গন্ধকেই আর তাঁহাদের নাসায় প্রবেশ করিতে দেয়না। কেবল কি ইহাই সখি! কেবল ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে তো গুরুজনের সাক্ষাতে লজ্জাহানির সম্ভাবনা থাকিতনা, নাসিকায় কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ অনুভবের কথা কেহ জানিতে পারিত না। কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধটি রমণীদিগের নিকটে আসে বোধ হয় সেই তনুহীন কন্দর্পটিকে সঙ্গে করিয়া; অঙ্গগন্ধের অন্তরালেই বোধ হয় সেই তনুহীন দেবতাটি আত্মগোপন করিয়া থাকে। তখন দুইজনে মিলিয়া নানারূপে কুলবতীদিগকে বিড়ম্বিত করিতে থাকে—গুরুজনের সাক্ষাতে তাঁহাদের কেশবন্ধন, নীবীবন্ধন খসাইয়া দেয়—তাঁহাদিগকে পাগলিনী করিয়া দেয়, তখন তাঁহাদের হিতাহিতজ্ঞান থাকেনা, অল্প কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকেনা—একমাত্র সেই গন্ধের আধার শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই তাঁহাদের মনে একমাত্র অনুসন্ধান জাগাইয়া দেয়—তখন তাঁহারা পাগলিনীর ছায়া উল্লংঘ্যে ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণেই দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। এইরূপ অদ্ভুত এই অদ্ভুত ডাকাইতের আচরণ।”

১১। সেই গন্ধের—শ্রীকৃষ্ণের সেই অঙ্গগন্ধের। বশ—বশীভূত। পিয়া—পান করিয়া। পিণ্ডো—পান করিব। তভু—পেট ভরিয়া পান করিয়াও। কৃষ্ণপ্রেমের একটা বিশেষত্ব এই যে, অভীষ্ট বস্তুকে পাইলেও পাওয়ার পিপাসা মিটে না, বরং এই পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। “তৃষা শাস্তি নহে, তৃষা বাঢ়ে নিরন্তর। ১। ৪। ১০ ॥”

“শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বোধ হয় কোনও মোহিনী-বিদ্যা জানে—তাই রমণীদিগের নাসিকাকে সম্যক্রূপে বশীভূত করিয়া ফেলে; এজতাই বোধ হয় তাঁহাদের নাসিকা সর্বদাই ঐ অপরূপ গন্ধ আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত ;



মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট, | বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ, | গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,  
জগন্নারী গ্রাহক লোভায় । | ঘর বাইতে পথ নাহি পায় ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কিন্তু উৎকণ্ঠিত হইলেও নাসিকা সকল সময়ে ইচ্ছামাত্রেই সেই গন্ধ পায় না—কখনও পায়, আবার কখনও পায় না । যখন পায়, তখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যথেষ্ট পরিমাণেই তাহা আশ্বাদন করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যথেষ্ট পরিমাণে আশ্বাদন করিয়াও তাহার আশ্বাদনের আকাঙ্ক্ষা মিটে না—বরং যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে, তাই সর্বদাই কেবল—“পিণ্ডো পিণ্ডো” রব তার মুখে! গন্ধ পাইলেও নাসিকার তৃষ্ণার শাস্তি নাই; কিন্তু যদি না পায়, তখন তো নাসা যেন তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়াই মরিয়া যায়—তখনকার প্রাণান্তক কষ্ট-অবর্ণনীয় সখি!”

৯২ । এক্ষণে শ্লোকস্থ “স মে মদনমোহনঃ” ইত্যাদি শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন ।

মদনমোহন—রূপ-গুণাদির অনির্বচনীয়-শক্তিতে স্বয়ং মদনকে পর্য্যস্ত মোহিত করেন যিনি, তিনি মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ । নাট—নৃত্য, চাতুর্য্য, কৌশল । রমণীদিগকে ফাঁদে ফেলিবার কৌশল । পসারি—প্রসারিত করিয়া, বিস্তৃত করিয়া । গন্ধের হাট—যে হাটে ( বাজারে ) গন্ধ বিক্রয় হয় । জগন্নারী গ্রাহক—জগতের রমণীসমূহরূপ-গ্রাহক । লোভায়—প্রলুব্ধ করে ।

“মদনমোহনের নাট” ইত্যাদি ত্রিপদীর অর্থ—মদনমোহনের নাট গন্ধের হাট প্রসারিত করিয়া জগন্নারীরূপ গ্রাহকগণকে প্রলুব্ধ করে ।

“মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ নারী-ধরার এক কৌশল করিয়াছেন; তিনি একটা হাট বসাইয়াছেন, সেই হাটে তাঁহার অঙ্গগন্ধ বিক্রয় হয়; সেই গন্ধের প্রলোভন দেখাইয়া, জগতে যত রমণী আছেন, সকলকেই তিনি আকর্ষণ করেন—তাঁহারা গন্ধ কিনিবার জন্ত গ্রাহকরূপে ঐ হাটে আসেন । যাঁহার রূপে, গুণে, গন্ধে, কৌশলে স্বয়ং মদন পর্য্যস্ত মোহিত হইয়া যায়, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বিক্রেতা । একে তো সেই গন্ধের লোভ, তাতে আবার দোকানদারের অগমোদ্ধমাধুৰ্য্যময় রূপদর্শনের লোভ; তার উপর আবার, ঐ গন্ধ সাধারণের নিকটে বিক্রয় করিবার জন্ত দোকানদার তাহা প্রকাণ্ড বাজারে উপস্থিত করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন!! এই অবস্থায় কোন্ রমণী আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন সখি! তাই লজ্জাদি বিসর্জন দিয়া লোভের প্রবল আকর্ষণে রমণীকুল ঐ হাটের দিকে ধাবিত হইতেছেন ।”

যদি কেহ বলেন, কুলবতী রমণীগণ ঐ গন্ধের হাটে আসেন কেন? উত্তর—যাঁর গন্ধে স্বয়ং মদন পর্য্যস্ত মোহিত হয়, তাঁর গন্ধের লোভ সংবরণ করার শক্তি সাধারণ রমণীগণের কিরূপে থাকিবে? তাই তাঁহারা লজ্জাদি সমস্ত বিসর্জন দিয়া গন্ধের জন্ত হাটে আসিয়া উপস্থিত হন । ইহাই বোধ হয় এই ত্রিপদীতে মদনমোহন-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা ।

হাট-শব্দের তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, রমণীগণ লজ্জাবশতঃ সাধারণতঃ হাটে আসেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের এমনি লোভনীয়তা যে, তাঁহারা লজ্জাদি বিসর্জন দিয়াও ঐ গন্ধের হাটে আসিয়া উপস্থিত হন । হাট-শব্দে গন্ধের প্রাচুর্য্যও সূচিত হইতেছে ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “গন্ধের হাট” স্থানে “চাঁদের হাট” পাঠ আছে । এস্থলে বোধ হয় গন্ধকেই চন্দ্র বলা হইয়াছে—চন্দ্রের নিম্নত্ব ও তাপহারিত্বের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের নিম্নত্ব ও সত্তাপহারিত্বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ।

অথবা, সমস্ত ত্রিপদীর অঙ্গরূপ অর্থও বোধ হয় হইতে পারে :—মদনমোহনের নাট, পসারি চাঁদের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায় ।

নাট—নাটমন্দির । পসারি—দোকানদার ।

এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি, | যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,  
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায় । | কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

মদনমোহন-শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরূপ নাটমন্দিরে হাট বসিয়াছে; বহুসংখ্যক চন্দ্র তাহাতে দোকান পাতিয়াছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বিক্রয় করে ।

কিন্তু দোকানদার-চন্দ্রসমূহ কি ? মধ্যালীলার ২১শ পরিচ্ছেদে কামগায়ত্রীর অর্থপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সাড়ে চব্বিশটি চন্দ্র আছে—তাহার মুখ একচন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্ধচন্দ্র, ললাটস্থ চন্দ্রনবিন্দু এক চন্দ্র, দশটি কর-নখ দশচন্দ্র এবং দশটি পদনখ দশচন্দ্র—এই সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র । এই সমস্ত চন্দ্রগণই গন্ধের দোকান পাতিয়া বসিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ নাটমন্দিরে । ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ, গণ্ড, ললাট, নখ—প্রত্যেকের গন্ধই পরম লোভনীয় ।

নাটমন্দির সাধারণতঃই চিত্তাকর্ষকরূপে সুসজ্জিত থাকে ; শ্রীকৃষ্ণের দেহের চিত্তাকর্ষকতা অতুলনীয়, তাহাতে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয় । এইরূপ পরম-রমণীয় দেহকে গন্ধের হাট ( বাজারের স্থান ) বলাতে, কেবল মাত্র হাটেরই পরম-লোভনীয়তা স্মৃতিত হইতেছে । তারপর দোকানদার-চন্দ্রগণের প্রত্যেকের লোভনীয়তাও অতুলনীয় ; সকলের সমবেত লোভনীয়তার কথা তো দূরে । সর্বোপরি কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের লোভনীয়তা । এতগুলি লোভনীয় বস্তু যেখানে, সেখানে যাওয়ার লোভ কোনও রমণীই সম্বরণ করিতে সমর্থ্য নহেন—তাই লজ্জাদি বিসর্জন দিয়া সকলে ঐ হাটের দিকে ধাবিত হন ।

রমণীদিগের লোভের আরও একটা হেতু বলিতেছেন—গন্ধ বিনামূল্যে বিক্রয় হয় ; যে হাটে যায়, তাহাকেই দেওয়া হয় ; কোনওরূপ মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না ; একবার হাটে যাইতে পারিলেই হয় ।

কোনও বস্তুর নিমিত্ত লোভ জন্মিলেও হাটে যদি পয়সা না থাকে, তাহা হইলে কেহ বাজারে যাইতে ইচ্ছা করে না ; কারণ, বাজারে গেলেও লোভনীয় বস্তুটা কিনিতে পারিবে না । কিন্তু যখন জানা যায় যে, কোনও মূল্যই লাগিবে না, একবার হাটে যাইতে পারিলেই বস্তুটা পাওয়া যাইবে, তখন হাটে যাওয়ার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারে না ।

গন্ধ দিয়া করে অঙ্গ—পূর্ববর্তী ৮৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য ।

যর যাইতে পথ নাহি পায়—চক্ষু অঙ্গপ্রায় হইয়া যায় বলিয়া পথ দেখিতে পায় না ।

ঐ হাটে গেলেই বিনামূল্যে গন্ধ পাওয়া যায় । রমণীগণ এইরূপে যখন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পায়, তখন ঐ গন্ধের প্রভাবে তাঁহাদের চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়, তাহারা যেন উন্মত্তের ছায় হইয়া পড়েন ; গৃহের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা, কুলধর্মাদির কথা—কোনও বিষয়েই আর তখন তাঁহাদের কোনওরূপ অনুসন্ধান থাকে না ।

৯৩। এইমত ইত্যাদি ; অন্বয়—এইমত, ( কৃষ্ণের অঙ্গ ) গন্ধে ( প্রভুর ) মন চুরি করিল ; ( তখন ) গৌরহরি ভৃঙ্গপ্রায় ইতিউতি ধাইতে লাগিলেন ।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর । ভৃঙ্গপ্রায়—ভ্রমরের মত । ইতিউতি—এদিক্ ওদিক্ ; ইতস্ততঃ । ভৃঙ্গপ্রায় ইতিউতি ধায়—অশোকের তলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সময় হইতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাইতেছিলেন ; সেই গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া তিনি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূণ্য হইয়াছিলেন । ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর যেমন ফুলের অধোগে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে আকৃষ্টচিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও তেমনি গন্ধের উৎস শ্রীকৃষ্ণের অধোগে দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন ।

স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,  
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল ।  
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,  
মহাপ্রভুর বাহুস্পৃশ্তি কৈল ॥ ৯৪

মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্তে মুখসংঘর্ষণ,  
কৃষ্ণগন্ধস্পৃশ্যে দিব্য নৃত্য ।  
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,  
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ভূঙ্গের সঙ্গে প্রভুর তুলনা দেওয়ার আরও সার্থকতা বোধ হয় এই যে, উড়িয়া যাইবার সময় ভ্রমর যেমন গুন্ গুন্ শব্দ করে, ছুটাছুটি করিবার সময়েই বোধ হয় প্রভুও উপরোক্ত প্রলাপ-বাক্য-সমূহ বলিয়াছিলেন ।

**বৃক্ষ-লতা-পাশে**—উদ্ভানস্থিত বৃক্ষ-লতার নিকটে ।

**কৃষ্ণ স্পৃশ্যে সেই আশে**—সেখানে হয় তো কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন এই আশায় ।

প্রভু কৃষ্ণগন্ধে উন্নতের ছায় হইয়া উদ্ভানের বৃক্ষ-লতার নিকটে ছুটিয়া যান—মনে করেন, সেখানে গেলেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন । কিন্তু সেখানে গিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে পান না—কেবল কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ মাত্র অমুভব করেন ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় বৃক্ষ-লতার নিকটে যাওয়া উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ ।

৯৪ । **স্বরূপ রামানন্দ গায়**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ প্রভুর ভাবানুকূল ললিত-লবঙ্গ-লতাদি পদ-কীর্তন করেন ।

**প্রভু নাচে সুখ পায়**—স্বরূপ-রামানন্দের গীত শুনিতে শুনিতে গীতের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নৃত্য করেন এবং নৃত্যকালে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অমুভব করিয়া অন্তরে সুখও পান ।

**এই মত ইত্যাদি**—স্বরূপাদির গীত ও প্রভুর নৃত্যাদিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল ।

প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ নানা উপায়ে প্রভুকে বাহুদশায় আনয়ন করিলেন ।

“স্বরূপ রামানন্দ রায়” স্থলে “স্বরূপ রামানন্দ গায়” পাঠও আছে । অর্থ—স্বরূপ রামানন্দ কীর্তনাদি করিয়া নানা উপায়ে প্রভুর বাহুস্পৃশ্তি করাইলেন ।

৯৫ । এই পরিচ্ছেদে, প্রভুর মাতৃভক্তি-প্রকটন, দিব্যোন্মাদে প্রলাপবাক্য, গম্ভীর ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ-স্পৃশ্যে প্রভুর দিব্য নৃত্য—এই চারিটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে—ইহাই এই ত্রিপদীতে গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী জানাইতেছেন ।

**মাতৃভক্তি**—প্রভুর মাতৃভক্তি । নানাবিধ সংবাদাদি লইয়া জগদানন্দ পণ্ডিতকে নদীয়ায় প্রেরণ ব্যাপার ।  
**প্রলপন**—দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রলাপ ।  
**ভিত্তে মুখ-সংঘর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্পৃশ্যে উদ্বেগ বশতঃ গম্ভীরা হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টায় দেওয়ালে মুখ-ঘর্ষণ ।  
**এই চারিটি লীলা ভেদ**—মাতৃভক্তি, প্রলপন, মুখ-সংঘর্ষণ ও দিব্যনৃত্য এই চারিটি লীলা ।  
**কৃষ্ণদাস**—গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামী ।  
**রূপগোসাঞির ভৃত্য**—রসতত্ত্বাদি-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামিচরণ গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু ; তাই তাঁহার ভৃত্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন ।

**কবিরাজ গোস্বামীর মন্ত্রগুরু-প্রসঙ্গ** । জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত বলেন, এই ত্রিপদীর অন্তর্গত “কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য”-বাক্যে গোস্বামী জানাইতেছেন যে, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই তাঁহার মন্ত্রদাতা দীক্ষা গুরু । তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি বলিলেন, ( ক ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সারস্বরসদা টীকার উপসংহারেও কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—“শ্রীকৃষ্ণ চরণাজালি-কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা । কৃষ্ণকর্ণামৃতশ্চৈবা টীকা সারস্বরসদা ॥—শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

চরণপদ্মের ভৃঙ্গ কৃষ্ণদাস-কর্তৃক কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারস্বরসদানামী এই টীকা বর্ণিত হইল।” এবং (খ) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—“মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ ॥ শ্রীকৃপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ । শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮ ॥ এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার । তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯ ॥” তিনি বলেন—১৭শ পয়ারে কবিরাজ প্রতিজ্ঞা (প্রস্তাব) করিতেছেন, তিনি তাঁহার মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের কথা বলিবেন। তার পরেই ১৮শ এবং ১৯শ পয়ারে শিক্ষাগুরুরূপে যে ছয় জনের নাম বলিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই শ্রীকৃপের নাম বলিয়াছেন। মন্ত্রগুরু এবং শিক্ষা-গুরুগণের কথা বলার প্রস্তাব করিয়া মন্ত্রগুরুর কথা কিছু বলিয়াই শিক্ষাগুরুগণের কথা বলিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। প্রথমে মন্ত্রগুরুর কথাই বলিবেন। সুতরাং সর্বপ্রথমে তিনি যখন শ্রীকৃপগোস্বামীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শ্রীপাদ কৃপগোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু।

উল্লিখিত যুক্তির উত্তরে যাহা বলা যায়, তাহা এই :—(১) শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী নিজেকে শ্রীপাদ কৃপগোস্বামীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে শ্রীপাদরূপকে তাঁহার প্রভু বলিয়াই পরিচয় দিলেন। ইহাতেই যদি শ্রীপাদরূপকে তাঁহার দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারই অমুরূপ উক্তি অমুরূপে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীকেও তাঁহার দীক্ষাগুরু বলা চলে; যেহেতু কবিরাজ নিজের লিখিয়াছেন—“সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১।১০।১০১ ॥”—তিনি আরও লিখিয়াছেন—“নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যার মুঞি দাস ॥ ১।১১।২২ ॥” এই পয়ারোক্তি অমুরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দকেও কবিরাজগোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলা চলে। “দাস” এবং “প্রভু” শব্দদ্বারা যদি দীক্ষাগুরু নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে মনে করিতে হয়—শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীপাদরূপ এবং শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী—ইহাদের প্রত্যেকেই কবিরাজ-গোস্বামীর মন্ত্রগুরু; কিন্তু দীক্ষাগুরু একাধিক হয় না। সুতরাং “কৃষ্ণদাস কৃপগোস্বামীর ভৃত্য”—কেবল এই উক্তিদ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, কবিরাজগোস্বামী শ্রীপাদ কৃপগোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য।

(২) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকার উপসংহার-বাক্য হইতেও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। শ্রীপাদ কৃপগোস্বামী, কবিরাজ-গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু। রসতত্ত্বাদি-বিষয়ে শ্রীপাদরূপ “যোগ্যপাত্র” ছিলেন বলিয়া রস-শাস্ত্র প্রচারের উপযোগিনী শক্তিও যে মহাপ্রভু তাঁহাতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন—একথা স্বয়ং মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন (৩.১।৮০)। শ্রীপাদরূপের নিকটে এবং শ্রীপাদরূপের কৃপায় কবিরাজগোস্বামী রস-বিষয়ে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন (১.৫।১৮১), তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি কর্ণামৃতের টীকা “সারস্ব-রসদা” লিখিয়াছেন। শ্রীল কৃপগোস্বামীর চরণরূপ পদ্ম হইতে ভ্রমররূপে তিনি যে মধু আহরণ করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার সারস্বরসদা টীকায় বিতরণ করিয়াছেন—“শ্রীকৃপচরণাজালি কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। সারস্বরসদা ॥”—বাক্যের তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে। সুতরাং এই বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধান্ত করা যায় না যে—তিনি শ্রীপাদরূপের মন্ত্রশিষ্য।

(৩) উপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে যে কয়টি পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে, আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত এস্থলে তৎ-সংশ্লিষ্ট সব কয়টি পয়ারই উদ্ধৃত হইতেছে। “কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫ ॥ এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন। প্রথমে সামায়ে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৬ ॥ তথাহি—বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। তৎ প্রকাশাংষ্ট তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্। মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ ॥ শ্রীকৃপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮ ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯ ॥ ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। তাঁসভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ২০ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার। তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১ ॥ নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যার মুঞি দাস ॥ ২২ ॥ গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি । তাঁহাদের চরণে যোর সহস্র  
প্রণতি ॥ ২৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্ । তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪ ॥ সাবরণে প্রভুরে  
করিয়া নমস্কার । এই ছয় তেঁহো যৈছে—করি সে বিচার ॥ ২৫ ॥”

এই কয় পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, “কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি” ইত্যাদি পয়ারেই কবিরাজগোস্বামীর  
মূল প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। সর্বশেষ “সাবরণে প্রভুরে” ইত্যাদি পয়ার হইতেও তাহা  
বুঝা যাইতেছে। “কৃষ্ণ, গুরু” ইত্যাদি ছয় বস্তু রূপে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিহার করেন, তাহা  
প্রতিপন্ন করাই কবিরাজগোস্বামীর উদ্দেশ্য—ইহাই মূল প্রতিজ্ঞা। তাহা প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করার পূর্বে  
তিনি বলিয়াছেন—“এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ-বন্দন। প্রথমে সামায়ে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১।১।১৬ ॥” ইহা  
বলিয়াই “বন্দে গুরুনিত্যাदि” শ্লোকটি বলিলেন; এই শ্লোকের মধ্যে এই ছয় তত্ত্বের উল্লেখ ও এই ছয় তত্ত্বের  
উদ্দেশ্যে নমস্কার আছে। এই শ্লোকের উল্লেখই ছয় তত্ত্বের চরণ বন্দনা করা হইল। শ্লোকের পরবর্তী আট  
( ১৭-২৪ ) পয়ারে শ্লোকেরই অমুবাদ দেওয়া হইয়াছে; অমুবাদের মধ্যে কে কোন্ তত্ত্ব, তাহারও উল্লেখ করা  
হইয়াছে। “মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ । তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১।১।১৭ ॥”—এই পয়ারটি প্রতিজ্ঞা-  
বাক্য নহে; ইহা হইতেছে শ্লোকস্থ “গুরুন্ বন্দে” বাক্যের অমুবাদ। শ্লোকের “গুরুন্”-শব্দটি বহুবচনান্ত, গুরুগণ।  
“গুরুন্—গুরুগণ”-শব্দে কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, অমুবাদে তাহাই তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন—“মন্ত্রগুরু  
আর যত শিক্ষাগুরুগণ।” তার পরে শ্রীকৃপাদি ছয় গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই ছয়জন তাঁহার  
শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ করিলেন না; অথচ এই ছয় গোস্বামীই যে তাঁহার শ্লোকের “গুরুন্”-শব্দের  
লক্ষ্য—“মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ” যে এই ছয় গোস্বামীর নামের দ্বারা প্রকাশ করিলেন, তাহা স্বীকার  
না করিয়া উপায় নাই। এই ছয় জনের এক জনকে কেবলমাত্র “দীক্ষাগুরু” মনে করিলে শিক্ষাগুরু হইয়া পড়েন  
পাঁচজন; অথচ তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাগুরু ছয়জন। ইহার সমাধান এই যে—এই ছয় শিক্ষাগুরুর  
মধ্যেই একজন তাঁহার দীক্ষাগুরুও। কিন্তু তিনি কে, কবিরাজ এস্থলে তাহা বলেন নাই। শ্রীকৃপের নাম সর্বপ্রথমে  
উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই শ্রীকৃপকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু,  
বৈষ্ণবাচার্য্য-শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রায় সর্বত্রই শ্রীশ্রীকৃপ-সনাতনের নাম সর্বাগ্রে লিখিত হয়।

উল্লিখিত ভক্ত বৈষ্ণব-মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার কথিত প্রমাণগুলি হইতে তাহা তিনি অমুমানমাত্রই  
করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দেখাইতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কেবল অমুমানের উপর  
নির্ভর করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে  
শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর দুইটি উক্তি হইতেই জানা যায়—শ্রীরঘুনাথ তাঁহার দীক্ষাগুরু, শ্রীকৃপ নহেন। উক্তি  
দুইটি এই :—“শ্রীস্বরূপ শ্রীকৃপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ ॥ ৩।২০।৮৮ ॥ শ্রীস্বরূপ শ্রীকৃপ শ্রীসনাতন।  
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥ ৩।২০।১৩৬ ॥” প্রথম পয়ারের “শ্রীগুরু” কি শ্রীরঘুনাথের বিশেষণ, না কি শ্রীজীবের  
বিশেষণ, তাহা হয়তো নিশ্চিতরূপে স্থির করা যায় না; কিন্তু দ্বিতীয় পয়ারে “শ্রীগুরু” শব্দ “শ্রীরঘুনাথের” পূর্বে  
লিখিত হওয়ায় সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না। “গুরু”-শব্দে সাধারণতঃ দীক্ষাগুরুকেই বুঝায়।

কিন্তু কোন্ রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজের দীক্ষাগুরু? রঘুনাথ ভট্ট? না কি রঘুনাথ দাস?

কবিরাজ-পরিবারের ভক্তদের অনেকগুলি গুরুপ্রণালিকা দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। এসমস্ত  
গুরুপ্রণালিকা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃপগোস্বামীর শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ  
গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস-গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃপ কবিরাজ-গোস্বামী। ইহার পরে ভিন্ন ভিন্ন

এই মতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন ।  
 স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ ৯৬  
 অলৌকিক কৃষ্ণলীলা—দিব্য শক্তি তার ।  
 তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার ॥ ৯৭  
 এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে ।  
 পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ( ১।৪।১২ )—  
 ধৃগুশ্রায়ং নবপ্রেমা যন্তোন্মীলতি চেতসি ।  
 অন্তর্কালীভিরপ্যস্ত মুদ্রা স্তষ্টু স্বহৃগমা ॥ ৭  
 অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া ।  
 তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

গুরুপ্রণালিকাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয় । এই গুরুপ্রণালিকা হইতে জানা গেল—শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু । এই গুরুপ্রণালিকাকে অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না । উক্ত ভক্ত বৈষ্ণব মহোদয়ও উহার কৃত্রিমতাসম্বন্ধে কোনও প্রমাণের উল্লেখ করিতে পারেন নাই ।

আবার কবিরাজ গোস্বামীর নিজের রচিত “শ্রীমদ্রঘুনাথ-ভট্টগোস্বাম্যষ্টকম্”-নামক অষ্টকে তিনি স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু ; এবং তাঁহাকে স্বচরণে আশ্রয় দিয়া শ্রীল ভট্টগোস্বামী যে তৎক্ষণাৎই তাঁহাকে শ্রীল রূপগোস্বামীর চরণে অর্পণ করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ তাহাও ঐ অষ্টকে লিখিয়াছেন । “মহং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্রূপপদারবিন্দমতুলং মানপিতঃ স্বাশ্রয়াৎ । নিত্যানন্দ-রূপাবলেন যমহং প্রাপ্য প্রকৃষ্টোহভবং তং শ্রীমদ্রঘুনাথভট্টমনিশং প্রেন্না ভজে সাগ্রহম্ ॥ যঃ কোহপি প্রপঠেদিদং নমঃ পুরোঃ প্রীত্যাষ্টকং প্রত্যহং শ্রীরূপঃ স্বপদারবিন্দমতুলং দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ । তন্মৈ শ্রীব্রজকাননে ব্রজযুবকদন্ত নৈবামৃতং সমাগৃহ্ষচ্ছতি সাগ্রহং প্রিয়তরং নাহুদ্ যতো ভো নমঃ ॥” শ্রীল রূপগোস্বামী হইলেন শ্রীল কবিরাজের পরম-গুরু ; তাঁহার গুরুদেব রূপা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পরম-গুরুর চরণেই অর্পণ করিয়াছেন । ইহা হইতেই নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝা যায়—কবিরাজ কেন বলিয়াছেন “কৃষ্ণদাস রূপগোস্বামির ভৃত্য” এবং “শ্রীরূপচরণাজালি-কৃষ্ণদাসেন ।”

এই অষ্টকের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণও উক্ত ভক্ত বৈষ্ণব-মহোদয় উল্লেখ করিতে পারেন নাই । যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অষ্টক বা কবিরাজ-পরিবারের গুরুপ্রণালিকা কৃত্রিম বলিয়া নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকেই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলিয়া মানিয়া লওয়া সম্ভব মনে হয় । শ্রীরূপগোস্বামী যে তাঁহার দীক্ষাগুরু নহেন, পূর্বোক্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তিই তাহার প্রমাণ ।

৯৭। দিব্যশক্তি—অচিন্ত্যশক্তি ।

তর্কের গোচর নহে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত চিন্ময়ী লীলা ; ইহা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন । এজ্ঞ ইহা মাহুষের সাধারণ যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ! “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ ।”

৯৮। পণ্ডিতেহো ইত্যাদি—কেবল পণ্ডিতের বলে কেহই কৃষ্ণপ্রেমিকের আচরণ বুঝিতে সমর্থ নহে ।

শ্লো। ৭। অম্বয় । অম্বয়াদি ২।২৩।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

৯৮-পন্নারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

৯৯। মহাপ্রভুর প্রলাপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, বা যে সকল ভাব প্রকটিত হইয়াছে, কিম্বা মহাপ্রভুর আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে—সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে—তবে তাহা অলৌকিক । লৌকিক জগতে যে তথাকথিত প্রেম দেখা যায়, তাহার প্রভাবে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে । কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উহা স্বাভাবিক ; তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহের পোষণ করিবে না—এসমস্ত ধ্রুবসত্য, ইহাই বিশ্বাস করিবে ।



ইহার সত্যত্বে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে ।  
 শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে ॥ ১০০  
 মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে ।  
 পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে ॥ ১০১  
 মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দৌহার দাসের দাস ।  
 যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস ॥ ১০২  
 শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিতে পাইবে মহাসুখ ।  
 খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুখ ॥ ১০৩

চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন ।  
 শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১০৪  
 শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।  
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫  
 ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অস্ত্যখণ্ডে বিরহ-  
 প্রলাপমুখসজ্জ্বর্ণাদিবর্ণনং নাম  
 ঊনবিংশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

### গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চীকা ।

১০০ । রাধা ভাবাবিষ্ট প্রভুর আচরণ এবং প্রলাপ যে সত্য—শ্রীমদভাগবতের ভ্রমরগীতায় উল্লিখিত শ্রীরাধার প্রলাপবচনই তাহার প্রমাণ । ভ্রমরগীতায় শ্রীরাধার এইরূপ চেষ্টা ও প্রলাপবচনের উল্লেখ আছে ।

ভ্রমরগীতা—শ্রীমদভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪৭শ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোককে ভ্রমরগীতা বলে । উদ্ধবের আগমনে একটি ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণদূত মনে করিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা প্রলাপ করিয়াছিলেন ; ভ্রমরগীতায় ‘মধুপ কিতববন্ধো’ ইত্যাদি দশটি শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ।

১০১ । মহিষীর গীত—দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তিনী থাকিয়াও প্রেমবৈচিত্র্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতিতে যে সকল প্রলাপকীর্তন করিয়াছিলেন, শ্রীমদভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৯০ম অধ্যায়ে ‘কুররি বিলপসি’ ইত্যাদি দশটি শ্লোকে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে ।

দশমের শেষে—শ্রীমদভাগবতের ১০ম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে ( ৯০ম অধ্যায়ে ) ।

১০২ । উক্ত প্রলাপাদির মর্ম্ম পণ্ডিত লোকও বুঝিতে পারে না ; তাই পণ্ডিত লোকেরও তাহাতে বিশ্বাস হয় না ; কিন্তু যাহার প্রতি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ও তাঁহাদের দাসাম্বদাসের কৃপা হইয়াছে, তিনিই উহা বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে তাঁহার অচল বিশ্বাসও জন্মিবে । স্থূলতঃ, গৌরভক্তের কৃপাব্যতীত এ সকল প্রলাপের মর্ম্ম বুঝা যায় না ।

১০৩ । আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ । কুতর্কাদি দুঃখ—শাস্ত্রবিগর্হিত তর্কদ্বারা যে দুঃখ জন্মে ।

১০৪ । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অপূর্ব মাহাত্ম্যের কথা বলিতেছেন । ইহা নিত্যই নূতন, যতবারই শুনা যাউক না কেন, কখনও পুনরায় শুনিতে অনিচ্ছা হইবে না ; সর্বদাই মনে হইবে, যেন, এইমাত্র ইহা প্রথমবার শুনিতছি । বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থরূপেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বিরাজমান । প্রভুর মাধুর্য্যও যেমন নিত্য নূতন, তাঁহার লীলাকথার মাধুর্য্যও তেমনি নিত্যনূতন ।

শ্রীকৃষ্ণবিরহার্জা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার স্বরূপের যে বৈচিত্র্য অতিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে এস্থলে দু’একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ।

### প্রেমবিলাসবিবর্ত-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর এবং বিপ্রলস্ত-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর ।

স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আশ্বাদনের—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শ্রীরাধা যেভাবে আশ্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে আশ্বাদনের—ভ্রমরগীতায় শ্রীকৃষ্ণের বলবতী এবং ক্রমশঃ বুদ্ধিশীলা লালসা । মাধুর্য্য-আশ্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম—আশ্রয়জাতীয় প্রেম । যাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আশ্বাদন করিতে পারেন । প্রেমের পূর্ণতম বিকাশের নাম হইল মাদন—মাদনাধ্য

গৌর কৃপা-ভরদ্বীপী টীকা ।

মহাভাব; ইহা কেবল শ্রীরাধার মধ্যেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনের কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তাই, স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আশ্বাদনের বাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হওয়ার জন্য তাঁর লালসা। মাদনের আশ্রয় হওয়ার জন্যই তাঁহাকে শ্রীরাধার সহিত নিবিড়তম ভাবে মিলিত হইতে হইয়াছে, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায় বলিতে গেলে—“তদ্ব্যয়ৈক্যমাপ্তম্” হইতে হইয়াছে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মিলিয়া এক হইতে হইয়াছে, “রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ” হইতে হইয়াছে; শ্রীরাধার প্রতি গৌর অন্তরারা স্বীয় প্রতি শ্রাম অঙ্গে নিবিড়তম ভাবে আলিঙ্গিত হইয়া শ্রামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে; শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর কথায়, “অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর” হইতে হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় “কৃষ্ণবর্ণ দ্বিবাক্ষ” হইতে হইয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ এবং মাদনাখ্য-মহাভাবই তাঁহার স্বরূপগত ভাব—তিনি স্বরূপে মাদনের আশ্রয়। তাঁহার মধ্যে মাদনের বিকাশেই তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ। মাদনের বিকাশ হয় মিলনে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে। এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাদনের উচ্ছ্বাসও ততই আধিক্য ধারণ করিবে। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন। আবার প্রেম-বিলাস-বিবর্তেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের চরমতম বিকাশ। সুতরাং শ্রীরাধার প্রেম-বিলাস-বিবর্তের ভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন আবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার মধ্যেও মাদনের পূর্ণতম বিকাশ লক্ষিত হইবে। এক্ষণেই ২৮।১৫৬ পয়ারের টীকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রেম-বিলাস-বিবর্তের মুর্ত্ত বিগ্রহ বলা হইয়াছে। ইহাই গৌরের স্বরূপ; যেহেতু, এই বিগ্রহেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের সর্বাতিশয়ী বিকাশ।

কিন্তু মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত প্রলাপোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় সমস্তই দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রলাপ—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর শ্রীমুখ হইতে উৎসারিত প্রলাপ। এ সমস্ত প্রলাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের বা বিপ্রলম্বের মুর্ত্ত বিগ্রহই বলা যায়; কেহ কেহ তাহা বলিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রভুর এই বিপ্রলম্ব-বিগ্রহকে তাঁহার স্বরূপের বিগ্রহ বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিবিড়তম মিলন এবং মাদনই প্রভুর স্বরূপগত ভাব। বিরহে মাদনের বিকাশ নাই, আছে মোহনের বিকাশ। মোহন প্রভুর স্বরূপগত মুখ্য ভাব নহে। অবশ্য যে মোদন বিরহে মোহন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, মাদন স্বয়ং-প্রেম বলিয়া সেই মোদন মাদনেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত; তথাপি কিন্তু মোদন এবং মাদন এক নহে; মোদন অপেক্ষা মাদনে প্রেমের এক অনির্বচনীয় সর্বাতিশয়ী বিকাশ; মাদন হইল সর্বভাবোদগমোন্মাদী; মোদন কিন্তু তাহা নহে, মোহনও তাহা নহে। তাই মোহন-সম্মত দিব্যোন্মাদের বিগ্রহকে মাদন-সম্মত প্রেম-বিলাস-বিবর্তের বিগ্রহের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না। মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায় মোহন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেই দিব্যোন্মাদ এবং তজ্জনিত প্রলাপাদির অভ্যুদয় হয়। তখন তাঁহার মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া; কারণ, মিলনেই মাদনের উল্লাস। “রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ” গৌরও যখন শ্রীরাধার মোহনাখ্য-ভাবের আবেশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার মধ্যেও তাঁহার স্বরূপগত-মুখ্যভাব মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া। মোহন যেমন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার স্বরূপগত সর্বপ্রধান ভাব নহে, রাধাভাবাবিষ্ট গৌরেরও তাহা স্বরূপগত সর্বপ্রধান ভাব নহে।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্ত-স্মৃতক “পহিলি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল” ইত্যাদি যে গানটি রায়-রামানন্দ কর্তৃক গীত হইয়াছিল, তাহার “ন সো রমণ ন হাম রমণী। দুহু মন মনোভব পেশল জানি।”-ইত্যাদি অংশেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত-স্মৃতি হইয়াছে (মিলনেই ইহা সম্ভব); পরবর্তী “অব সোই বিরাগ” ইত্যাদি অংশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিরহের কথাই বলা হইয়াছে; এই অংশে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত স্মৃতি হয় নাই। যেহেতু, বিরহে বিলাসই সম্ভব নয়। উক্ত গানে প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথাতে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার চরমতম

গৌর-কৃপা-ভরদ্বীপী চাঁক।

পরাকাষ্ঠার কথা বলিয়া তাহার পরে তাঁহার বিরহের কথা বলা হইয়াছে; প্রেমবিলাস-বিবর্তেই শ্রীরাধা-প্রেম-মহিমার পরাকাষ্ঠা, বিরহে নহে; তথাপি বিরহও তাঁহার প্রেম-মহিমার যে এক অপূর্ণ বৈচিত্রী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর দিব্যোন্মাদও প্রেমবিলাস-বিবর্ত-বিগ্রহ-শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এক অপূর্ণ ভাববৈচিত্রী; বিপ্রলম্ব-বিগ্রহ গৌরও প্রেমবিলাস-বিবর্ত-বিগ্রহ গৌরের এক অপূর্ণ প্রকাশ—ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য মিলিত স্বরূপ, তখন তাঁহাতে বিরহের ভাব কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—ইহা অসম্ভব নয়; প্রেম-বৈচিত্র্যের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কুশিতা শ্রীরাধার মধ্যেও বিরহের ভাব উদ্ভূত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাও অল্পভব করিতেছেন; দিব্যোন্মাদে প্রেমের যে মহিমা অভিযুক্ত হয়, তাহার আশ্বাদন না করিলে তাঁহার রাধাপ্রেম-মহিমা জানার বাসনাই যে অন্ততঃ আংশিকভাবে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটি হইতেছে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা জানিবার বাসনা; শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বা। নানা ভাবে প্রভুর এই বাসনাটি পূর্ণ হইয়াছে। রাম রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-তত্ত্ব আলোচনার ব্যপদেশে প্রভু রায়ের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই ধ্যাপন করাইয়াছেন; ইহাতেই শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার এক বৈচিত্রী উদ্ঘাটিত করাইয়া প্রভু তাহা আশ্বাদন করিয়াছেন; তাহাতে মহিমার এক বৈচিত্রী জানিবার বাসনাও পূর্ণ হইয়াছে। রাম-রামানন্দের সঙ্গে এই সাধ্য-তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমবিলাস-বিবর্তের ভাবে আবিষ্ট হইয়া “রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ”-গৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাধুর্যের চরমতম পরাকাষ্ঠা আশ্বাদন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আশ্বাদনের ঐশ্বর্য ব্রজলীলায় তাঁহার যে এক অপূর্ণ বাসনা ছিল, তাহাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহা মাধুর্য আশ্বাদনের একটি বৈচিত্রী মাত্র। অন্ত্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসলীলার স্বপ্নদর্শনে “ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥ ৩।১৪।১৬ ॥”-স্বরূপের দর্শনে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আর এক বৈচিত্রী আশ্বাদন করিয়াছেন। আবার জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভু যখন “জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৩।১৫।৬ ॥” এবং এই দর্শন মাতেই যখন “একিবারে সুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৩।১৫।৭ ॥”, তখনও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আর এক বৈচিত্রীর আশ্বাদন পাইয়াছেন; অন্ত্য ষোড়শ পরিচ্ছেদোক্ত “সুকুতিলভ্য ফেলালব”-প্রাপ্তিতে প্রেমের আশ্রয়রূপে প্রভু শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের মাধুর্যও আশ্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসান্তে জলকেলির দর্শনেও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আর এক বৈচিত্রীর আশ্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বলিতে কেবল রূপ-মাধুর্যই বুঝায় না, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-আদির সকল রকম মাধুর্য-বৈচিত্রীই বুঝায়। এই সমস্ত শ্রীরাধিকা যে ভাবে আশ্বাদন করেন, সেই ভাবে আশ্বাদনের জগুই ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহরূপে প্রভু তাহা আশ্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে শ্রী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—তিনি প্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই; দিগদর্শনরূপে কয়েকটি লীলামাত্র বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন “আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাসাটুনি। সে যৈছে তুষায় পিয়ে সমুদ্রের পাণি ॥ তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৩।২০।৮১-২ ॥” কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত এবং অবর্ণিত বহু লীলাতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আশ্বাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধার জায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আশ্বাদন কেবলমাত্র মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রভাবেই সম্ভব। এই মাদনের সহায়তাতেই প্রভু এই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আশ্বাদন করিয়াছেন এবং এই আশ্বাদনের ব্যপদেশে স্বীয় মাধুর্যের স্বরূপ এবং এই মাধুর্য আশ্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই সুখের স্বরূপও অবগত হইয়াছেন। এইরূপে “অননৈবাস্বস্তো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। গৌণ্যাকাঙ্ক্ষা মদমুত্তমতঃ কীদৃশং বা”-এই বাসনাষয়েরও পরিপূরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা যেমন মাদনঘন-বিগ্রহা, তদ্রূপ এই

গৌর-কৃপা-ভরসিগী টীকা ।

আস্বাদনেও “রসরাজ মহাভাব হইয়ে একরূপ” গৌরও মাদনঘন-বিগ্রহ । এই আস্বাদনেই গৌরের নিজস্ব স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় ।

রাসলীলা, জলকেলি-আদির দর্শনের সময়ে প্রভু দূরে থাকিয়াই এসকল লীলা দর্শন করিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু দূরে থাকিয়া দর্শন করিলেও—সুতরাং দর্শন-কালে প্রভু অল্প গোপীর ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইলেও—প্রভুতে তখনও মাদনের আবির্ভাবই ছিল ; যেহেতু, মাদন হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত ভাব । ৩।১৪।১৬-১৭-পর্যায়ের টীকায় “অল্প গোপীভাবে প্রভুর বৈশিষ্ট্য”-অংশ দ্রষ্টব্য ।

তারপর দিব্যোন্মাদের কথা । মোহনের অভ্যুদয়েই দিব্যোন্মাদ হয়—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই এই মোহন ভাব প্রকাশ পায় । “দিব্যোন্মাদায়োহপ্যচ্ছে বিবদভিরমুকীর্ততাঃ । প্রায়ো বৃন্দা-বনেশ্বর্যাং মোহনোয়মুদয়তি ॥ উঃ নীঃ স্থা, ১৩২ ॥” সুতরাং দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুতেও শ্রীরাধারই ভাবের আবেশ ; শ্রীরাধার ভাবের আবেশ বলিয়া ইহাও প্রভুর স্বরূপগত ভাবেরই আবেশ ; স্বরূপগত ভাবের আবেশ হইলেও ইহা স্বরূপগত মুখ্য ভাবের—মাদনের—আবেশ নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইহা হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত রাধাভাবের একটী বৈচিত্রী ।

দিব্যোন্মাদে অসহ্য যন্ত্রণা থাকিলেও অনির্কচনীয় রসমাধুর্য্যও আছে । “বাছে বিষজালা হয়, তিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্বুত চরিত ॥ ২।২।৪৪ ॥ পীড়াভিনবকালকূট-কটুতা-গর্ভস্থ নির্কাসনো নিঃশ্বদেন মুদাং সুধামধুরিমাঙ্কার-সঙ্কোচনঃ । প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরে জাগতি যন্তান্তরে জায়ন্তে স্ফুটমন্ত বক্রমধুরান্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ বিদগ্ধমাধব । ২।৩০ ॥” তাই, শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশেও প্রভু মাধুর্য্যের এক অদ্বুত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন । মাধুর্য্যের আস্বাদন কেবল যে মিলনে হয়, তাহা নহে ; বিরহেও মাধুর্য্যের আস্বাদন হইয়া থাকে ।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধার সুখের স্বরূপ জানিবার জন্তই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বাসনা ; দুঃখের স্বরূপ জানিবার জন্ত তো তাঁহার বাসনা জাগে নাই ; তবে, বিষজালাময় দিব্যোন্মাদের আবেশ প্রভুর কেন হইল ?

ইহার উত্তর বোধহয়, এইরূপ । প্রথমতঃ, দুঃখই সুখকে মহীয়ান্ করিয়া তোলে । অল্প যেমন মিষ্টবস্তুর মাধুর্য্যকে চমৎকারিতা দান করে, তক্রূপ । তাই নিত্য-সন্তোষময় মাদনেও বিরহের স্ফুর্তি দেখা যায় । বিশেষতঃ, বিরহযন্ত্রণা প্রেমজনিত-আত্যন্তরিক আনন্দকে কি এক অপূর্ণ অনির্কচনীয় সুখ দান করে, তাহা না জানিলে সেই সুখের স্বরূপও সম্যক জানা যায় না । দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশে প্রভু যে উৎকট-দুঃখাবৃত পরমানন্দের অমূল্য ভোগ করিয়াছেন, শ্রীরাধাসুখের স্বরূপ জানিবার পক্ষে তাহাও অপরিহার্য্য ।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার পক্ষেও দিব্যোন্মাদের প্রয়োজন আছে । রাধাপ্রেমের একটা বৈচিত্রী প্রকাশিত হয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে । রাসলীলা, জলকেলি-আদির স্ফুরণে, সেই বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে । প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেও তাহা প্রকটিত হইয়াছে । কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম আশ্রয়ের উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, দিব্যোন্মাদাদিতেই তাহা জানা যায় । প্রেমের আশ্রয়ের উপরে এই প্রেমের কিরূপ বিষময় জালা, দিব্যোন্মাদেই তাহা জানা যায় ; ইহা না জানিলেও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাজ্ঞান অপূর্ণ থাকিয়া যায় । তাই দিব্যোন্মাদের প্রয়োজনীয়তা ।

রাধাপ্রেমের প্রভাবের আর একটা বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে—প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দীর্ঘাকরণে এবং প্রভুর কৃষ্ণাকৃতি-করণে । প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সর্বশক্তিমান্ হইতে পারেন ; কিন্তু রাধাপ্রেমের প্রভাবের নিকটে তাঁহার সর্বশক্তিমান্ভার গর্ভও খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় ( ৩।১৪।৬৩ পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

এইরূপে দেখা গেল—দিব্যোন্মাদে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা, এবং রাধাপ্রেমের মহিমা অমূল্যভবের বাসনা পূর্তির আনুকূল্য হইয়াছে । তথাপি কিন্তু ইহা প্রভুর মুখ্য স্বরূপগত ভাব নহে ; ইহার হেতু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তবে ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভাবের বিরোধীও নহে, একদেশমাত্র ।